প্রেমের ঠাকুর

শ্রীশ্রীমৌনীবাবা



শ্রীকেতকীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মচারী (গুরুদাস)



উৎসর্গ

ওঁ বিষ্ণুরোম-তৎসৎ ওঁ

যাঁহার প্রেরণায় ও কৃপাবলে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই অমূল্য চরিতামৃত রচিত হইল, সেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুচরণে তাহা ভক্তি অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলাম।

বিক্রয়লব্ধ অর্থ গুরু তহবিলে জমা হইবে এবং গুরুদেবের উৎসবাদিতে ও জনকল্যাণমূলক কাজে প্রয়োজনানুসারে মিশন কর্তৃপক্ষ ব্যয় করিতে পারিবেন। এই অর্থে আমার পুত্রাধিকারীদের কোন অধিকার থাকিবে না। ইতি—

শ্রীগুরুপদারবিন্দভিক্ষু—

শ্রীকেতকীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মচারী (গুরুদাস)

প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীমৌনীবাবা

গ্রন্থকার ও প্রকাশক : শ্রীকেতকীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মচারী (গুরুদাস)

সর্ব্বস্বত্ব : গ্রন্থকার দ্বারা সংরক্ষিত।

প্রাপ্তিস্থান : আনন্দময় মৌনীবাবা মিশন
পোঃ রাণীবাড়ী
জিলা করিমগঞ্জ, আসাম।

প্রথম সংস্করণ : সন ১৫ বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪০৫ বাংলা
২৯ এপ্রিল, ১৯৯৮ ইংরাজী।

বিনিময় : গুরু তহবিলে প্রণামীস্বরূপ ৪৫ টাকা।

মুদ্রণ : মিনার্ভা প্রেস, করিমগঞ্জ।

ওঁ ঐঁ শ্রীগুরুবে নমঃ

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

নিবেদন

কোন মহাপুরুষের জীবনীগ্রন্থ লিখার সংকল্প অথবা প্রয়াস যদিও সৌভাগ্যসূচক, তথাপি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আমার মত সাহিত্য প্রতিভাহীন অযোগ্য ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে। পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশ কাহারও পক্ষে জগতে অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই এবং হইবেও না। ভগবানের অবতার, সদ্‌গুরু, মহাপুরুষদের পূত-জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী ও যোগ বিভূতির কিঞ্চিৎ যহা দৃষ্টিগোচর হয় বা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার কিয়দংশ প্রকাশের চেষ্টা করা হয়।

ভারতে কত সাধক, মহাসাধক গোপনে নরলীলা করিয়া গিয়াছেন যাঁহাদের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। কাহার জীবদ্দশায় প্রচারে আপত্তি থাকায় প্রকাশ করা হয় নাই। যাঁহাদের প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও অতি সামান্য।

সূর্য্য স্ব-প্রকাশ। তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। তাঁহার সামান্য তেজ আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমাদের পৃথিবী হইতে সূর্য্য অনেক দূরে, তাঁহার সমস্ত তেজ একত্র করিলে পরিণাম কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ কোটী সূর্য্যের তেজ যে ব্রহ্মে তাঁহাকে প্রকাশ করা কোন মানুষের পক্ষে স্বতঃই সম্ভবপর নয়। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবেৎ। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ মহাপুরুষের কতটুকু আমরা জানিতে বা বুঝিতে পারি? কতটুকুই আমরা প্রকাশ করতে পারি? শুধু লোক শিক্ষার জন্য ভক্ত সাধকদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সাধনে প্রবুদ্ধ করার জন্য এই সামান্য প্রয়াস। ইহার দ্বারা সমাজ মানুষের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। কেহ সহজে বিশ্বাস করে, কেহ বা অবিশ্বাস করে, কেহ সন্দেহ উপস্থিত হইলে আলোচনা কারার সুযোগ পায়, যে আজ অবিশ্বাস করিতেছে তাহারও একদিন মানসিক পরিবর্তনের দ্বারা আত্মোন্নতি হইতে পারে। সুতরাং সমাজ মানুষের লাভ প্রচুর ইহাতে সন্দেহ নাই।

সংসারে অপরিচিত প্রচার বিমুখ যে মহাসাধক মহামানবের জীবনের উপর সামান্য আলোকপাত করার প্রয়াস করিতেছি তিনি আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ব্রহ্মচারী, ওরফে দক্ষিণেশ্বরের মৌনীবাবা, স্বামী সচ্চিদানন্দ — নামে যোগীশ্বর। এতদ্অঞ্চলে তিনি তোষসাধু নামে পরিচিত।

দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুভ্রাতা ভগ্নীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যেহেতু আমাদের গুরুদেবের জীবনীগ্রন্থ এবং উপদেশাবলী অদ্যবধি প্রকাশ হয় নাই। আমি ঠাকুরের প্রকট অবস্থায় একখানা সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য কবিতা ছন্দে লিখিয়া প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম তাঁহার ৮২ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে, তিনি আমাকে বারণ করিয়া বলিলেন, "আমাকে বিজ্ঞাপনের গুরুবানাবি না। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের প্রচার করিয়া যান নাই, আমার শরীর ছাড়ার পর ইচ্ছা করিলে করিও; এখন না"।

২৪ শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৫ বাংলা, ৮ই মার্চ্চ ১৯৮৯ ইংরাজীতে যোগবলে মহাপ্রয়াণের পর হইতেই জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের চিন্তা করিতেছি। কিন্তু নানা কারণে একদিকে সরকারী চাকুরী অন্যদিকে পারিবারিক ঝামেলায় অদ্যাবধি সম্ভব হয় নাই। ভক্তদের মধ্যেও কেহই অগ্রসর হন নাই। ঠাকুরের সাধন জ্ঞানের ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানি না। কেবল একদিন বলিলেন— "তুই কি বুঝবি ওসব? রমেশঠাকুরকে মা ও বাবা দর্শন দিয়েছেন। হঠ্যোগ রাজযোগ সিদ্ধপুরুষের অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। বৃন্দাবনে রাধারাণী ও আমাকে কৃপাকরেছেন। জীবনে সব দেখা হয়ে গিয়েছে। অনেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। রামঠাকুর, স্বামীনিগমানন্দ প্রমুখ মহাসিদ্ধ সাধকরা ভালবাসতেন খুব। এখন রমেশঠাকুর ভিখারী, কিছুই নাইরে। বিষয় বুদ্ধি ছিল না বলেই তো কিছু করে যেতে পারলাম না। প্রভুর যেমন ইচ্ছা। তোরা মানুষ হয়ে গেলেই আমার এত কঠোর তপস্যা গুরুগিরি সার্থক হবে। ধন-সম্পত্তি, যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা। ওসবের চিন্তাও করবি না যদি পরমার্থ লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। শুধু গুরুতে বিশ্বাস থাকলে তোদের

সবই লাভ হবে। গুরুকৃপাছাড়া কিছু হয় না রে। নিজের চেষ্টায় অনেক দূর যাওয়া যায়, শেষ দরজার কপাট গুরু খুলিয়া না দিলে কাহারও ক্ষমতা নাই। ত্রি-বিন্দু, ত্রিরেখা ভেদ করা কি সহজ ব্যাপার ? তর্ক না করে কর্ম্ম করে যাও। যা বলি মন দিয়ে শুনতে হয়"।

গুরু হইলেও সম্পর্কে দাদু, আমার মার বড় মামা। বৃদ্ধকে খুব প্রশ্ন করিতাম, জ্বালাতন করিতাম। মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া যাইতেন এবং কান্না জুড়িয়া দিতেন, বলতেন— "পোড়া কপাল আমার; সারা ভারতে অন্ততঃ লক্ষাধিক লোককে নাম দিয়াছি, একটাও মানুষ হইল না"। মাথা ঠাণ্ডা হইলে একেবারে মাটির মানুষ, প্রেমে বিগলিত রাগারাণী। "ও নাতি, আমার অনেক সন্ন্যাসী শিষ্য আছে হিমালয়ে; খুব উন্নতি করিয়াছে। ওঁকার করিত আমার সঙ্গে বসিয়া। আনন্দময় কোষ পার করিয়া দিয়াছি অনেককে। তুই তো বালক, এখন বুঝবি না। ধরমতলার কালীপদ এবং অনেকে প্রাণায়াম করিতে করিতে উপরে উঠিয়া যাইত। এই স্থূলদেহে কৈলাসে, মহাকাশে ও গিয়াছিরে। প্রশান্তমহাসাগরে মৎস্যকন্যা দেখিয়া আসিলাম। কত যে অঘটন জগতে ঘটিবে ঈশ্বরই জানেন। তোদের বিশ্বাস হয় না। আমিও নিগমানন্দস্বামী একবার মণিপুরের রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু বৃষ্টি থাকায় নীচে নামিতে পারিনাই। পরে কলিকাতায় ফিরে এসে প্রস্রাব করি"। অলৌকিক গল্প মাঝে মাঝে মেজাজ ভাল থাকিলে করিতেন। দিবারাত্র ঘুমাইতেন না ব্রহ্মানন্দ সুখ হারানোর ভয়ে। খাওয়া দাওয়া ছিল অতি সামান্য। একবার তো ত্রিশদিন পার হইলে জল ও ভোগ গ্রহণ করিলেন। অনাহারে ও কষ্ট হইত না। বলিতেন, "তোদের লক্ষ্মীনারায়ণই গুরু, গুরুই জগন্নাথ। পুরীতে গিয়া কি করিবি ? আমার কাছেই থেকে যা। গোপেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া কাহাকেও সচ্চিদানন্দ শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে উপদেশ দিতেন। রাণীবাড়ী আশ্রমেও সচ্চিদানন্দ শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন, "আমি এখানেই থাকব"। ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষং নমস্তে দিব্য চক্ষুষে, নমঃ পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ— এই মন্ত্রের মধ্যে আমি থাকব এবং এই মন্ত্রে প্রণাম করলেই আমার কাছে পৌঁছিবে"।

যুধিষ্ঠিরের কাতরতা শুনিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থিব শরীর ত্যাগের সময় বলিয়াছিলেন — ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে, প্রণত: ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নম: মন্ত্রে প্রণাম করিলে তাঁহাব কাছে পৌঁছিবে। এই আশ্বাসবাণী দ্বিতীয়বার শোনা গেল মৌনীবাবার পার্থিব শরীর ত্যাগের সময়।

সুতরাং মৌনীবাবা যে ভারতের মহাসাধকদের অন্যতম এই বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনে নানাধরণের যোগবিভূতি পূর্ণ ঘটনাবলী থাকে ও প্রকাশিত হয় এই ক্ষেত্রে ও ব্যতিক্রম নাই। তাঁহার সামান্য জীবনালেখ্য পর্য্যালোচনা করিলে ভক্ত-হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ, প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়বে। এই পবিত্র গ্রন্থ ও ঠাকুরের একখানা ফটো প্রত্যেক মানুষের ঘরে থাকিলে অবশ্যই উপকার হইবে এবং পার্থিব তথা পারমার্থিব উন্নতি হইবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আগেই বলিয়াছি সাহিত্য রচনার যোগ্যতা আমার নাই এবং এই কল্পনাও জীবনে করিতে পারি নাই, শুধু ঠাকুরের বাক্যে এই প্রয়াস। ভক্তদের প্রশ্নোত্তর কালে একদিন বললেন — "জীবনী গ্রন্থ নাই তো কি হইল? কিরে ঠিক কইলাম কি-না? আমার কেতকী লিখিতেছে ও প্রকাশ করিবে। ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা কালে যে ভাষা প্রয়োগ করিতাম যথাযথ প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা যেমনই হউক বিষয়বস্তু অর্থাৎ সংসারের সং ছাড়িয়া সার গ্রহণের চেষ্টা করিলে পাঠকদের উপকার হইবে এবং আমারও শ্রম সার্থক হইবে। কবিতা, গান লেখাও হঠাৎ শুরু হয়, কয়েকখানা গ্রন্থের শেষে দিলাম।

পরম প্রেমময় ঠাকুর নিজেই মেজাজ ভাল থাকিলে বলিতেন, "ওরে, মন্ত্রশিষ্য আর কয়জন হয়? তাতে কি আছে? মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি সকলের উপরই পড়ে। মহাপুরুষের ইচ্ছায় অনেকের দীক্ষাও হইয়া যায়। উপযুক্ত সময়ে সাক্ষাৎভাবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া প্রথমে কিছু ভোগ থাকে এবং এরপরে অনন্তসাধনের দিকে ছুটিতে থাকে। মহাসিদ্ধ পুরুষরা যেসব দেশে ভ্রমণ করেন ও বাস করেন সেইসব দেশের ভূমিও পবিত্র হয় এবং জীব-জগতের মঙ্গল হয়। এরা কেবল নিজের মুক্তি চান না, ভগবানের প্রদর্শিত

পথ দেখাইয়া মানবজাতির মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। যাঁরা জগদ্‌গুরু তাঁরা কেবল কয়েকজনেরই গুরু নন, মানবজাতির গুরু, উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শক। উপদেশের কি অভাব আছে. তবুও বারবার বলতে হয় এবং শুন্‌তে শুন্‌তে যদি দুই-চারজনের ভ্রম দূর হইয়া ধর্ম্মে মতি হয়, মুক্তিপথে অগ্রসর হয়, তবু ভাল। অনেকে তো আমাকে পাগল বলে। আমি কি সত্যিই পাগল রে ?" হয়ত গান শুরু করিলেন, "দেমা আমায় পাগল করে।"

মজার কথা, উনি কখনও তন্ময় হইয়া শ্যামাসংগীত করিতেন কখনও কৃষ্ণকমল গোস্বামী. জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পদাবলী গাইতেন বা তন্ময় হইয়া শুনিতে শুনিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকিতেন কখনও হুঁংকারে কাঁপাইয়া তুলিতেন। বলিতেন — "আমার হরিহরের উপাসনা, তোরা বুঝবে না। কেবল দমে দমে নাম কর্‌। কৃষ্ণনাম কর্‌ তবেই জগতের মঙ্গল হবে। মহাশ্মশানে বা পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করার যোগ্যতা কয়জনের আছে রে ? এইসবের তোদের দরকার নাই কেবল নাম কর। উপযুক্ত গুরু পাইলে যোগাবলম্বন করা দরকার। এক অন্ধ কি আরেক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে ? সাধনের দ্বারা যে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইতে পারিয়াছে, সমাধিসিদ্ধি হইয়াছে, সে-ই গুরু হইতে পারে। বউ, ছেলেমেয়েকে ভাসাইয়া ত্যাগী হইতে যাইও না। সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম হয়। জনসেবাও করা যায় যদি চরিত্র ঠিক থাকে এবং সততা মানবতা রক্ষা করিয়া চলা যায়। নইলে অষ্টরম্ভা চুষিতে হয়।

অষ্টসিদ্ধি যাঁহার করতলগত, কালীঘাটের মা কালী যাঁহার সেবা করিতেন, প্রমাণ পাইলেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাধুর বিবেকানন্দস্থ রোডের ফ্ল্যাটে, কীর্ত্তন. মহোৎসবে মহাপ্রভুর লীলাদর্শন করেন হাজার হাজার নরনারী রাণীবাড়ী আশ্রমে, অথচ তাঁহার কাছে বসিলে মনে হইত কত সরল সহজ মানুষ, পরদুঃখে কাতর, কত আপনজন। রাজা হইয়াও দীনাভিখারী। আকাশবৃত্তি যাঁহার অবলম্বন।

প্রায়ই বলিতেন, 'প্রচার করিয়া কি হইবে রে। তোমরা আগে মানুষ হও। সব সম্প্রদায় মিলিয়া মানুষ গড়ার কাজে লাগিয়া যাও। পরিবারে ধর্ম্মের অনুশীলন কর, বাচ্চারাও ভাল হইবে। বাচ্চাদের দোষ নাই রে।

ঘরে ও সমাজে বড়দের কাছেই তো ভালমন্দ শিখে। আমার প্রচারের দরকার নাই। যদি কেউ আমাকে গুরু মানো, আমাকে ভালবাসো, তবে তোমরা কর্ম্ম করো, আমি খুশী হইব— তোমরাও শক্তিলাভ করিবে এবং সমাজের উন্নতি হইবে। বড় কঠিন দিন সামনে আসিতেছে। বৈষয়িক ধান্দা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নিজেরই মঙ্গল চিন্তা কর। তোমার মঙ্গলেই তো সমাজের মঙ্গল।"

আমার প্রেমময় গুরুদেবের জীবনচরিতামৃত রচনা ও প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও অবদানের জন্য আমার দুইজন মামাতুতো বোন গুরুগতাপ্রাণা কুমারী অপর্ণা ব্রহ্মচারিণী (গুরুদাসী) ও কুমারী প্রতিমা ভট্টাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আর যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মহামানবের চরিতামৃত ও মহাযানী প্রকাশের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের সকলের পরমার্থ আনন্দ ও শান্তিলাভের জন্য শ্রীগুরুচরণে বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করি।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা যদি একটি আত্মার উন্নতি ও আনন্দলাভ হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক শ্রীগুরু চরণে, জগৎবাসীর মঙ্গল কামনা করিয়া এই ভক্তিঅর্ঘ্য অর্পণ করিলাম। ইতি—

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত—

১লা বৈশাখ, ১৪০৫ বাংলা শ্রীকেতকীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (গুরুদাস)



৺উমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (জনক)

শ্রী শ্রী আনন্দময় যোগীবর (অবধূত)



৺ধানদা সুন্দরী দেবী (জননী)

প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবা

ওঁ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ

ওঁ তৎসৎ ওঁ

॥ এক ॥

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

সাধু অর্থাৎ সৎ ব্যক্তিদের রক্ষার জন্য বা উদ্ধারের জন্য, দুষ্কৃতকারীকে দমন ও উদ্ধারের জন্য এবং ধর্ম্মের কুসংস্কার দূর করিয়া প্রকৃত সত্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবানকে বার বার পৃথিবীতে অবতরণ করিতে হয়। ভগবান সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজেও আপন মায়াদ্বারা নানা মূর্ত্তিতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে সৃষ্টি করেন বা অবতীর্ণ হন। অবতার, সদ্‌গুরু, ভগবান পরব্রহ্মের নানা নাম রূপ। যুগ বলিতে শুধু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিকেই বুঝায় না। যখনই পৃথিবীতে মানবসমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভূ-খণ্ডে ধর্ম্মের গ্লানি অনাচার, অত্যাচার ও অশান্তি মানুষের শান্তি ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন আর্ত্তের কাতর আহ্বান শুনিয়া ভগবান আর স্থির থাকিতে পারেন না। পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পার্ষদ ভক্তসহ নিজেই করুণাবশতঃ ধরাধামে নামিয়া আসেন। শুধু বিনাশ করার জন্যই আসেন না। তাঁহার নরলীলার মাধ্যমে জীবের শিক্ষা, শান্তিস্থাপন ও জীবের উদ্ধার করিয়া থাকেন। নূতন সৃষ্টির জন্যই ধ্বংস, আবার জীবের কর্ম্মফল অনুযায়ী জগতে আসা যাওয়ার খেলা শেষ হইলে তাহাদেরে নিজের কাছে লইয়া যান।

ভগবানের গুরুরূপের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। তাঁহাকে মানুষের মতই সুখ, দুঃখ, নানাবিধ জাগতিক ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়া সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া দীক্ষা, শিক্ষাদ্বারা মুক্তিপথে, কল্যাণের পথে পরিচালনা করিতে হয়। এইজন্য সর্ব্বশাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব সর্ব্বদেবময় গুরুর জয়গান করা হইয়াছে। অবতার ও সদ্‌গুরুর বিভিন্ন আলোচনা নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে অবতারের সঙ্গে যেসব

ভক্ত-পার্ষদ লীলাজগতে আসেন তাঁহারাও অবতার, গুরুও ভগবান অভিন্ন। সুতরাং গুরুকেও ভগবানের অবতার স্বরূপ অবতার বলিলে ভুল হওয়ার কারণ নাই। গুরুগীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবদ্গীতা যদি সত্য বলিয়া মানি তবে সদ্গুরুকেও জগদ্গুরু বা ভগবানের অবতার ভাবিলে ভুল হইবে না যেহেতু তাঁহার আবির্ভাব জীবের কল্যাণের জন্য ও সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য।

ব্রহ্মস্বরূপ মহাযোগী ও মহাপুরুষগণ জীবজগতের পরমবন্ধু হিতৈষী ও ধর্ম্মরক্ষক। ধর্ম্ম বলিতে আধ্যাত্মিক বহুবিধ সংজ্ঞাও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বাস্তবদৃষ্টিতে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবের জীবন যাত্রার যে প্রক্রিয়া তাহাই ধর্ম্ম। কর্ম্মই ধর্ম্ম। স্বভাব অনুযায়ী যে কর্ম্মই করা হয় তাহাই ধর্ম্ম। দুষ্কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ অমঙ্গলজনক কিছু করিলে অধর্ম্ম। নিজের তথা পারিবারিক, সামাজিক সৎকর্ম্মই ধর্ম্ম। কাহাকেও ধার্ম্মিক তখনই বলা হয় যদি সৎস্বভাব, সংযমী, বিবেকী ও পবিত্র মানবতায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে এবং আমাদের সমাজ জীবনে যেভাবে ধর্ম্মের বিপর্যয় ঘটিতেছে, ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা চলিতেছে, মানুষকে সুখে শান্তিতে বাঁচিতে হইলে ও সমাজে নিরাপদে বাস করিতে হইলে ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া চলিতে হইবে। ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ বিকৃতি করিয়াই নানাবিধ অপধর্ম্মের সৃষ্টি ও সামাজিক অশান্তিকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এক। মানুষের ধর্ম্মও এক। যদি কোন নাম দিতে হয় তবে বর্তমান যুগে ধর্ম্মের নাম শুধু "মানবতা"। তবেই মানুষে মানুষে প্রীতি, একতা ও সৌহার্দ্দপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হইবে। হিংসা, ভেদ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দ্বারা জগতের মঙ্গল দূরের কথা নিজেরই আত্মক্ষয় হইতেছে। সৃষ্টিকর্তার যদি সৃষ্টিরক্ষার পরিকল্পনা থাকে তবে এই ভেদ দূরীকরণ করিয়া আবার সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় জগতে নামিয়া আসিতে হইবে। নতুবা ভগবানের নামেই কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। তাই পরম করুণাময় ভগবান আর্ত্তের ক্রন্দনে, ভক্তের আহ্বানে বিশেষরূপে আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার মহাপ্রকাশ ঘটিয়াছে এবং তাঁহার লীলা মাহাত্ম্য, ধর্ম্মাদর্শ ও জনকল্যাণমূলক উপদেশাবলী জাতীয় জীবনে প্রকাশিত

ও প্রচারিত হইবে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে।

এই মহানপুরুষ পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারী বার বৎসর মৌন ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন স্থানীয় ভক্তরা নাম দিলেন "মৌনীবাবা"। নাথযোগী সম্প্রদায় ভুক্ত হঠ্‌যোগ রাজযোগ সিদ্ধ পুরুষের নাম হয় সচ্চিদানন্দ-নাম্নী যোগীশ্বর"। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটি আসনে তন্ত্র সিদ্ধিলাভের পর হিমালয় পরিক্রমা করেন। কাশী ও হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে হঠ্‌যোগ রাজযোগের অভ্যাস ও নির্ব্বিকল্প সমাধিসিদ্ধি লাভ করেন। (তারপর বৃন্দাবনে প্রেমসিদ্ধ হওয়ার পর লোকালয়ে পতিতপাবন গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।) হিমালয়ের বিভিন্নস্থানে কঠোর তপস্যায় জীবনের দীর্ঘসময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া যায়। বেশীর ভাগ সময় ঋষিকেশ আশ্রমেই কাটাইয়াছেন। গাড়োয়াল, কুমায়ূন ও উত্তরপ্রদেশে স্বামী সচ্চিদানন্দ নাম যোগীশ্বরের তৎকালে বেশ নাম ডাক ছিল। হিমালয়ে তাঁহার অনেক যোগী ও সন্ন্যাসী শিষ্য আছেন। বাংলাদেশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার তেমন প্রচার হয় নাই যেহেতু তিনি প্রচার বিমুখ ছিলেন। কোন বইপত্রে তাঁহার প্রচার নিষিদ্ধ করায় তিনি অদ্যাবধি অজ্ঞাত ও অপরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় তাঁহার বহু শিষ্য ভক্ত আছেন এবং তাঁহার অলৌকিক বহুলীলা দর্শনে মোহিত হইয়াছেন।

হাওড়া মনসুকাতে একটি আশ্রম বহুকাল পূর্বে করিয়াছিলেন নাম দেওয়া হয় "আনন্দময় ব্রহ্মবিদ্যাশ্রম", তাঁহার প্রথম দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীআনন্দময় ব্রহ্মচারীর নামানুসারে। শ্রীশ্রীআনন্দময় ব্রহ্মচারী মহাসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন এবং যোগবলে দেহত্যাগ করেন। ভাবাবেশে একদিন আমাদের ঠাকুর প্রকাশ করেন যে তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীআনন্দময় ব্রহ্মচারী পূর্বজন্মে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এই সুযোগে ভক্তরা অন্যান্য প্রশ্ন করিলে জবাব এড়াইয়া যান। তবে তাঁহার প্রেমাবেশ ও ভাবাবেশে স্ব-স্বরূপে অবস্থান হইতে তাঁহার পরিচয় পাইতে ভক্তদের বেশী বেগ পাইতে হয় নাই।

কখনও বলিতেন "ওরে, গুরুই জগন্নাথ"। আবার কখনও বলিতেন, "আমি কাহারও গুরু নই। গুরু জগতে একজনই"। আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। তাঁহার গুরুভক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি স্বয়ং জগদ্গুরু হইয়াও একাধারে গুরু শিষ্যত্বের অসাধারণসাধন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেবকরা মাঝে মাঝে তাঁহার রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। কখনও রুদ্রমূর্তি এবং কখনও প্রেমে বিগলিত রাধাভাবে আচ্ছন্ন। তাঁহার ভগবান ও ভক্ত দুইভাব ছিল। কখনও স্বয়ং রাজরাজ্যেশ্বর; আবার কখনও দীন ভিখারী। বলিতেন, "আমার বিষয় বুদ্ধি ছিলনা; নইলে কত রাজা, মহারাজা ধন দিতে চাহিয়াছে, আশ্রম করিয়া দিতে চাহিয়াছে, আমি প্রত্যাখান করিয়াছি। হালী শহরে প্রায় তিনশত বিঘা জমি ছাড়িয়া দিলাম। আমি জানি বড় আশ্রম করিলে অর্থের লোভে পড়িয়া অনেক ধর্মার্থী বিষয় পঙ্কিলে ডুবিয়া যাইবে এবং গুরুকে ও ডুবাইয়া দিবে! তাই তো আমি চির-ভিখারী, আকাশবৃত্তি অবলম্বন। ভগবান যখন যাহা দেন তাহাতেই আমার চলে"।

কোন ভক্ত শিষ্য প্রণাম করিয়া অর্থ, বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষপত্র শ্রদ্ধাভরে নিবেদন করিলে ঠাকুর কোন সেবক, সেবিকার মাধ্যমে গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দীন দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিতেন। আমি একবার দুইখানা চাদর ও একখানা কম্বল দান করিয়াছিলাম খুশী হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং একরাত্রি ব্যবহার করিয়া এক ভক্তকে দিয়া দিলেন আমার একটু অভিমান হইল, — অন্তর্য্যামী বুঝিতে পারিয়া সস্নেহে বলিলেন, — "তোর চাদর দুইখানা খুব ভাল হইয়াছে এবং গায়ে দিয়া বড় আরাম পাই। উলের কম্বলখানা ভাল হইলে ও আমার শরীরে সহ্য হয় না। তাই দিয়া দিলাম। তোর মন খারাপ করার কি আছে? আমি তো গ্রহণ করিয়াছি। গুরুকে সাত্বিক ভাবে কিছু দান করিলে সেই বস্তুর উপর দাতার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। গুরু যদি গ্রহণ করিয়া সেই বস্তু অপরকে বা দীন দুঃখীকে পুনরায় দান করিয়া দেন তবে তোমাদের মনে কষ্ট না পাইয়া এই সাত্বিক দানের জন্য আনন্দ ও গৌরব বোধ করা উচিত"। এই ব্যাপারে শুধু আমিই নই, অনেক গুরু ভাইবোন শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

ঠাকুর শহরে কিংবা গ্রামে গরীবদের ঘরে যাইয়া ভিক্ষা করিতেন। গরীবের শ্রদ্ধার দান সামান্য হইলেও ইহার মূল্য অনেক বেশী। অহংকারী ধনীর দান গ্রহণে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ক্ষতি হয়, সত্ত্বগুণ নষ্ট হইয়া যায়। দান সকলে করিতে পারেনা কারণ কেউ নাম ও যশের জন্য দান করে আবার কেউ বাধ্য হইয়া। বাধ্য হইয়া দান করায় মনে কষ্ট পায়। সত্যিকারের দাতা অল্পই হউক আর বেশীই হউক পরম শ্রদ্ধার সহিত দান করিয়াও ভাবে আরও কিছু দিতে পারিলে বোধহয় ভাল হইত। অষ্টসিদ্ধি যাঁহার করতলগত, কত রাজা, মহারাজা, ধনীগৃহস্থ ও ব্যবসায়ী শিষ্য থাকা সত্বেও অন্তিমদিন পর্য্যন্ত ঠাকুর দীন দরিদ্রের মতপূত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর বলিতেন, "প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, যাঁহারা কিছু শক্তিবিভূতি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠার লোভে পরমহংস কিংবা স্বয়ম্ভু অবতার সাজিয়া সমাজে খ্যাতি ও অর্থলাভে মাতিয়া ওঠে, তাহারা পরমার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের ও অপরের ক্ষতিসাধন করে। আজকাল পরমার্থ পথিকের সংখ্যা খুবই কম। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার হইয়াও নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। শঙ্করাচার্য্য, গৌরাঙ্গ এবং রামকৃষ্ণের আদর্শ ও ভাবধারাকে বাঁচাইয়া চাললে সমাজের মঙ্গল হইবে। সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইবে। দেখনা গাছে ফল পাকিতে দেয়না। কাঁচ অবস্থায় দুর্বৃত্তরা নষ্ট করিয়া দেয়। বড় কঠিন দিন সামনে আসিতেছে। সকলের সাবধানে চলা উচিত। এখন আপৎকাল চলিতেছে। ভগবানের নাম আশ্রয় করিয়া বুদ্ধিযুক্ত হইয়া চলিতে হইবে। পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে। মানুষ ঠেকিয়া শিখে। ধর্ম্মের উপদেশ আমি কি দিব তোমাদেরে? সংসারে মুনি-ঋষি অবতার, মহাপুরুষদের উপদেশ কিছু কম আছে কি? কয়জন উপদেশ মানিয়া চলে? উপদেশ অনুযায়ী কাজ করে? নূতন করিয়া উপদেশ দেওয়ার মত আমার কাছে কিছু নাই। সব গীতায় আছে। গীতার আলোচনা, নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন, ভগবানের নাম জপ ও কীর্তন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যকর্ম করিয়া গেলে বুঝিব পরমার্থ

পথে তোমার মতি হইয়াছে। সত্যাশ্রয়, সততা, বিন্দুধারণ, মানবতায় বিশ্বাসী, শুধু গুরু ভাইদের প্রতিই নয় সকল মানুষের প্রতি ভাইবন্ধু সুলভ ব্যবহার, প্রয়োজনে সেবাজ্ঞানে যথাসাধ্য সাহায্য, কাহারও বিশ্বাস নষ্ট না করিয়া আত্মোন্নতির পথে সহায়তা করা প্রভৃতি গুণ তোমাদের মধ্যে জাগিলেই বুঝিব তোমরা প্রকৃত ধর্ম বুঝিয়াছে। ধর্ম যে বুঝিয়াছে সে অপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারেনা। আর প্রারব্ধ ভোগ হেতু ভুলক্রমে লিপ্ত হইলে ও অনুশোচনার দ্বারা, ইষ্ট চিন্তা দ্বারা তাঁহার পাপ ক্ষয় হইয়া নির্ম্মল হইয়া যায়। যাহারা জাগিয়া ঘুমায় অর্থাৎ বাইরে ধর্ম্মের ভান করিয়া অন্তর শয়তানিতে লিপ্ত ভগবান তাদের কখনও ক্ষমা করেন না, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

ভগবানের রাজ্যে যে যত নীচ, তার তত্ত্বধর্ম্মে অধিকার। এর অর্থ তোমরা বোঝ কি? মাঝে মাঝে ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনা কালে এইসব প্রশ্ন করিতেন এবং নিজেই জবাব দিতেন। এখানে নীচ অর্থে বিনয়ী, শ্রদ্ধাভক্তিনত ভগবৎ ভক্তকেই বুঝায়। গুরু বিরাট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শিষ্যকে না দিয়া অনেক ক্ষেত্রে মূর্খ গুরু নিষ্ঠ শিষ্যকে গুরু গিরির দায়িত্ব দিয়াছেন। এইরূপ অনেক কাহিনী আছে, মোটেই মিথ্যা নয়।

গুরুকরণ ভিন্ন দেহশুদ্ধি হয় না, আত্মার মুক্তি হয় না। সাধন-ভজন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, নাম-কীর্ত্তনাদি করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। তবে ব্রহ্মজ্ঞান গুরুকৃপা ভিন্ন হয় না। "গুরু বক্তে স্থিতং ব্রহ্ম, গুরু ভক্ত্যাচ লভ্যতে।" একমাত্র গুরুতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া গুরুভক্তিদ্বারা সমস্ত আধ্যাত্ম সম্পদ লাভ হইতে পারে। মানুষ গুরুতে ভগবৎ জ্ঞানে খুব কম লোকেরই শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা জন্মে। ফলে মানুষ দীক্ষা নিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম, তীর্থভ্রমণ, জপ-তপ, দান-দক্ষিণা ইত্যাদি করিয়াও প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারেনা। ব্রহ্মলাভ তো দূরের কথা। কিছু শিষ্য চালাকি করিয়া গুরুর সেবা করিয়া কিংবা প্রচুর ধন দিয়া গুরুর শক্তিলাভ করিতে চায়. এই জাতীয় গুরুসেবা ও গুরুভক্তি ইষ্টলাভের জন্য নয় বরং কিছু বিভূতি লাভ করিয়া জীবন যাপন করাই অন্তরের অভিপ্রায়।

যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ সদ্‌গুরু, তাঁহাদের চোখে ধূলা দেওয়া কঠিন। যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিতে চায় বা প্রকৃত পরমার্থ পথের পথিক, তাঁহারা শুদ্ধচিত্তে শ্রীগুরুচরণে আত্মাহুতি দিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া যাইবে। তবে আর চিন্তা নাই। গুরু যখন দীক্ষা দিয়া শিষ্যের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়াছেন, তখন নির্ভরশীল শিষ্যকে কল্যাণের পথে অবশ্যই নিয়াছেন এবং এইরূপ শিষ্যেরই সিদ্ধিলাভ হয়।

আজকাল সবাই গুরু হইতে চায়। গুরুগিরি যেন এক মজার ব্যবসা। ভরণ-পোষণ, সম্মান, পূজা, প্রতিষ্ঠা সবই লাভ হয় বিনা পরিশ্রমে। প্রকৃত শিষ্য হইতে কেউ চায় না। যে গুরু হইবে তাহাকে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা শিষ্যত্বের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে আপন গুরুর কাছে। গুরুর দায়িত্ব যে কতখানি অজ্ঞব্যক্তি বুঝিতে পারেনা। সদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু, নরদেহে সর্ব্বসাধারণের মত আচরণ করিলেও বদ্ধজীব হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতিষ্ঠা যশের জন্য তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। কিসে বদ্ধজীবের মঙ্গল বিধান করা যায় সেই চেষ্টায় নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যান। বর্তমান জগতের ধর্ম্ম-কর্ম্ম দেখিয়া মনেহয় মানুষের বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সমাজ মানুষের চেতনা জাগাইতে হইবে নতুবা মানব সভ্যতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষ ধর্ম্ম মানে না এমন তো নয়। মন্দির, মসজিদ, গীর্জাতে উৎসবাদিতে ধর্ম্মার্থীর ভিড়, আনন্দ উল্লাস, তীর্থ দর্শন, স্নান-দানাদি সবই চলিতেছে। কিছু ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ঘৃণ্য স্বার্থ আদায়ের অভিপ্রায়ে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছে। উচ্চ-নীচ জাত-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিচ্ছিন্নকারীর দল সমাজের তথা সমগ্র মানব জাতির ক্ষতি সাধন করিতেছে। সাধারণ মানুষের ভালমন্দ বিচারের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের এত সময় কোথায়, অন্নচিন্তায় যাহাদের মাথা আচ্ছন্ন। প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী শিক্ষিতরা ও ভুল করিয়া বসে। ঋষিবাক্যে,

শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের পরিবর্তে জড় বিজ্ঞানের সহায়তায় কিছু তথ্য খাঁড়া করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়া বেড়াইতেছে। যোগী-ঋষিরাও মহাপুরুষরা শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ করিয়া সাধনে যথার্থ ও প্রত্যক্ষ ফললাভ করিয়া, সত্যতা প্রমাণ করিয়াই উপদেশ প্রদান করেন যাহাদ্বারা মানুষ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে। পার্থিব এবং পরমার্থ সম্পদ লাভ করিয়া জীবনে কৃত-কৃতার্থ হইতে পারে। সংসারে থাকিয়া বাল্যকাল হইতেই নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতে পারিলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুবর্গ ফললাভ করা যায়। গুরু মৌনীবাবা বলিতেন, "তোমরা আদর্শ গৃহস্থ হও। সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। এই সংসার ভগবানের। তোমার জীবন সুন্দর হইলে সংসার ও সুন্দর হইবে। তোমার কর্ম্মই ধর্ম্ম। সুখ,-দুঃখ, ভুক্তি-মুক্তি, আনন্দ-নিরানন্দ সবই তোমার কর্ম্মে নিহিত। ঋষিদের প্রণীত গ্রন্থাদিতে যেসব নীতি উপদেশ, দেওয়া আছে তাহা তোমাদের সুন্দর জীবন গঠনের জন্য। সুখ স্বাচ্ছন্ন ভোগের ভিতর দিয়া পরমার্থ লাভের জন্যই। তোমরা অমৃতের পুত্র। মৃত্যু তোমাদের কি করিতে পারে? তোমরা বোঝনা বলিয়াই কষ্ট পাও। ঈশ্বর তোমাদের সকলের হৃদয়েই বাস করেন। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করিতে পারিলেই অশান্তি জাগতিক দুঃখ, ভুল-বুঝাবুঝি দূর হইয়া যাইবে। বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান মানুষকে প্রদান করিয়াছেন সৃষ্টিকর্তা তাই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। তোমার এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ কর্ম্মেই দিতে হইবে। বিষধর সর্প, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার হিংসা শূন্য সিদ্ধ মহাপুরুষকে সমীহ করে। আমি কতবার বাঘ, ভালুকের পাল্লায় পড়িয়াছি, জঙ্গলে শুইয়া আছি বিষধর সাপ আমার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, কখনও খেলা করিত, আমি ভয় পাইতাম না। কাম, ক্রোধ, লোভ নরকের দ্বারস্বরূপ সকলের ত্যাজ্য"।

॥ দুই ॥

ঠাকুর মৌনীবাবার সাধক জীবনের বিশেষ কিছু আমার জানা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া তেমন উত্তর পাই নাই কারণ সেই সময় ঠাকুর প্রায়ই সমাধিমগ্ন থাকিতেন। বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করিলে বিরক্ত হইতেন।

এক দুই কথা যাহা জানিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিতেছি। নরলীলার ৯৫ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬০ বৎসর তন্ত্র, হঠ্‌যোগ, রাজযোগ, প্রেমসাধন, নানাবিধ কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত হয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও হিমালয়ে। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চবটী তলায় মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তন্ত্র সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সিদ্ধিস্থান ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রভৃতি দর্শন করার সৌভাগ্যলাভ করি ১৯৭৯ ইং ঠাকুরের নির্দ্দেশে। এত অল্পবয়সে সিদ্ধিলাভ, তাহাও সুদূর দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া। এইসব রহস্য এবং অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য জানার পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম, পিতৃপরিচয়, জন্মস্থান, বাল্যলীলা, গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ ও অবধূত সন্ন্যাসী জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু জানার আগ্রহ ভক্ত পাঠক-পাঠিকার অবশ্যই জাগিয়াছে। বৃহৎ গ্রন্থ পাঠের সময় ও ধৈর্য্য অনেকেরই নাই। তাই সংক্ষেপে একটু পরিচয় দিয়া যাইব।

ঠাকুরের সঙ্গে পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিত। প্রশ্নোত্তরে সেই ভাষা যথাসম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছি; কেন না দরদভরা সেই ভাষায় আমরা মোহিত হইয়া যাইতাম। শ্রীমতী অলোকা মান্না এম, এ (বাংলা) এবং আরও অনেকে পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষা প্রয়োগে আমাকে উৎসাহ দেন। ভাষার ভুল ত্রুটী না ধরিয়া মহামানবের পূত জীবন চরিত পাঠের আনন্দলাভের প্রয়াস করিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে এবং সাধক ভক্ত মাত্রের অনেক উপকার হইবে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রথম গুরু মহিমা প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রয়াস। পরবর্ত্তী সংস্করণে আরও তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিব।

ঠাকুর মৌনীবাবার পূর্ব্ব নাম শ্রীশ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারী। জন্ম ১৩০১ বাংলার জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ড পরগণার নয়াগ্রামে। বৈদিক ঘৃতকৌশিক গোত্র, কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জাত রমেশচন্দ্রের পিতা ৺রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হইলেও একজন সচ্চরিত্র ভগবৎ ভক্ত ছিলেন। পরম ভক্তিমতী স্নেহময়ী মাতা ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী স্বরূপা রত্নগর্ভা ছিলেন। তিনজন ভ্রাতা ও তিনজন ভগ্নীর মধ্যে রমেশচন্দ্র ছিলেন তৃতীয় এবং ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ৺কুমুদিনী দেবী পরম ভক্তিমতী আমার মাতামহী। দ্বিতীয়া ভগ্নী ৺সৌদামিনী

দেবী (অর্চ্চনা দেবী) স্বর্ণপদক প্রাপ্তা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এবং পরবর্ত্তীকালে মহাসিদ্ধা যোগিনীরূপে পরিচিতা হন। তৃতীয়া ভগ্নী ৺সুরঞ্জিনী দেবীও খুব ভক্তিমতী ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা ৺রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী কৃতি গৃহস্থ ছিলেন। পৈত্রিক বার্ষিক দুর্গাপূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি নিষ্ঠার সহিত করিতেন, যেহেতু জ্যেষ্ঠভ্রাতা সংসারে থাকিয়াও সংসার ত্যাগী। ৺রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী সমাজ জীবনে বুদ্ধিমান, গুরুভক্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺হরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি নিয়া ব্যস্ত থাকিলেও একজন কৃতি গীতিকার, সংগীত শিল্পী বিশেষ করিয়া শ্যামা সংগীতে দক্ষ ছিলেন। গুরুভক্ত ও একজন উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। বিশেষ কথা এঁরা সকলেই মহাসিদ্ধ শ্রীশ্রীআনন্দময় ব্রহ্মচারীর শিষ্য, শিষ্যা ছিলেন।

ঠাকুরের মেজদি ৺অর্চ্চনা দেবীর একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়া উচিত। ইনি দুই শিশুপুত্র লইয়া মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে বিধবা হন। কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শান্তিপুরে অধ্যাপনা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসেন এবং করিমগঞ্জের রাণীবাড়ীতে ভাই রমণীমোহনের সহায়তায় কিছু জমি খরিদ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র ৺অনাদিনাথ ভট্টাচার্য্যকে লইয়া বসবাস শুরু করেন। এই আলোচনার বিশেষ কারণ এই যে ৺অর্চ্চনা দেবীর পৌত্রী কুমারী অপর্ণা ব্রহ্মচারিণী (শুক্লা) ও গুরুদত্ত নাম "গুরুদাসী" গুরু মৌনীবাবার লীলাজগতে ভক্তিতত্ত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপা। ঠাকুরের অন্তিম লীলার শেষ কয়েক বৎসর নাতনী ও সেবিকা গুরুদাসী পরম নিষ্ঠার সহিত গুরুসেবা করে আজও ঠাকুরের সিদ্ধাসন রক্ষা করিয়া ও নিত্যসেবা চালাইয়া যাইতেছে।

৺অর্চ্চনা দেবী আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের যুগল বিগ্রহের নিত্যসেবা এবং গুরু আনন্দময় ব্রহ্মচারীর স্মৃতি রক্ষার্থে ৺আনন্দেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিত্যসেবা পূজা ও পূণ্য জন্মতিথি মাকরী সপ্তমী হইতে তিনদিন ব্যাপী অখণ্ড যজ্ঞ কীর্ত্তনাদি নিয়াই অবসর জীবন এবং অন্তিমবেলা পর্য্যন্ত নিমগ্না থাকিয়া ৮৯ বৎসর বয়সে

সজ্ঞানে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

নাতনী শ্রীমতী কৃষ্ণার বিবাহ ভোজের অবসরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বারান্দায় আমাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন এবং গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বৃদ্ধা আমাকে খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন— "তুই রমেশের প্রিয় শিষ্য। রমেশের মত এত বড় শক্তিধর মহাপুরুষ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে আর কেউ নাই। তুই তাহার আদর্শ মানিয়া চলবি রে ভাই। আমাদের দেশ তথা জগতের যে দুরাবস্থা নজরে পড়িতেছে, একা কিছু করা সম্ভবপর নয়। তবে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিয়া সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিয়া যাইবে এই আমার অন্তিম ইচ্ছা"।

আমাকে স্নেহ করার একটি বিশেষ কারণ ও আছে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধা অসুস্থ হইলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পূজার কর্ম্মে আমার বাবা কিংবা আমাকেই নিয়োগ করিতেন যেহেতু আমরা বৈষ্ণবাচার পালন করিতাম। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এক সিদ্ধা ব্রজবাসিনী এই যুগল বিগ্রহ ৺অর্চনাদেবীকে সেবা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করেন। এই বিগ্রহ যেন একেবারে জীবন্ত। ছাত্র জীবনে মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্নান, প্রসাদন, সেবা-পূজা-আরতি করিতে করিতে মনে ব্রজভাব কিংবা একটা সহজ প্রীতির ভাব জাগিয়া উঠিত। পরবর্তী কালে ঠাকুর যখন যুগল মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন তখন বাল্যকালের নানা অভিজ্ঞতা স্মরণ হইয়া গেল। জপে মগ্নাবস্থায় দুইটি শিশুর ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা শুনিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতাম। কোলে বসাইয়া আদর করার ইচ্ছা হইত কিন্তু সেই সৌভাগ্য জীবনে আর আসিল না। একদিন কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরকে এই ঘটনা জানাইলাম, শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, —"ওরে রাধাগোবিন্দ এবং তোদের বাড়ীর লক্ষ্মী-নারায়ণ বড় জাগ্রত। প্রভুর যেমন ইচ্ছা তেমনই হইবে। বাড়ীর বিগ্রহের আত্মবৎ সেবা করিতে হয়"। আমার বাবা লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা অনুভব করিতেন; তাই লোকসংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে পরিবারের কর্তা লক্ষ্মী-নারায়ণকেই বলিতেন।

এখন দেখা যাউক বালক রমেশের কি অবস্থা। মা-বাবার বড় ছেলে। পড়াশুনায় খুব ভাল তবে দুরন্তের শিরোমণি। দেহে অসাধারণ শক্তি। সমবয়সী ছেলেরা কুস্তিতে পারিয়া উঠিত না। সমবয়স্কদের নায়ক বালক রমেশচন্দ্র। মুক্তহস্তে দান করার স্পৃহা বাল্যকালেই ছিল। পরদুঃখে কাতর, আর্তের সেবায় কখনও ক্রটী ছিল না। পাড়ার কিংবা গ্রামের বয়স্কদের প্রিয়পাত্র রমেশ। কেমন দেব-দ্বিজে ভক্তি ছেলেটার। ছোট-বড় সকলেরই পরম হিতৈষী। ছেলেবেলায় চুরি করিয়া খাওয়া, দুষ্টামি সকলের সহ্যের মধ্যেই ছিল। তবুও পিতা ভাবিলেন ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার। তখনকার সময়ে ডিগ্রী থাকিলে বড় অফিসার হওয়া যাইত। ছেলেকে ইচ্ছা করিয়াই ভাল শিক্ষার জন্য দূরে করিমগঞ্জ শহরে গভর্ণমেন্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। হোষ্টেলে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। পড়াশুনা ভালই চলিতেছে। মেধাবী ছাত্র আর চিন্তা কি?

প্রকৃতির নিয়ম বিধির বিধান কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। ছেলেবেলা হইতেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট, নানাবিধ অশান্তি দেখিয়া এইসব দূরীকরণ করার উপায় চিন্তা করিতেন। তাঁহার মাঝে মাঝে মনে হইত এইসব দুর্গতদের দুঃখ মোচনের জন্যই তিনি জগতে আসিয়াছেন। লেখাপড়া করিলেও জীবনে কিছু একটা করিবেন এই সংকল্প মনে মনে করিলেন। দশম শ্রেণীতে পাঠরত রমেশচন্দ্র একদিন এক আগন্তুক সিদ্ধ বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। নাম না জানা সিদ্ধ বৈষ্ণবের নাম পড়িয়াগেল "হরিবোল বাবা"। অন্যান্য ছেলেদের কথা যেমনই হউক রমেশ কিন্তু হরিবোল বাবার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হইয়া একদিন শিক্ষকের অনুমতি লইয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া গেলেন আর ক্লাসে ফিরিলেন না হরিবোল বাবার সঙ্গে করিমগঞ্জ হইতে উধাও। কোথায় গেল কেউ জানে না সঙ্গী সাথীরা বলিল বোধহয় হরিবোল বাবার সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছে কেননা সুযোগ পাইলেই বৈষ্ণবের সঙ্গে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা ও কীর্তন করিত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই ঘটনা পিতাকে জানাইয়া গভীর

দুঃখ প্রকাশ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিলেন।

এদিকে পিতা-মাতার কি দশা। পরিবারে শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। সকল ভরসা মাটি হইয়া গেল। তখনকার সময়ে ভারত ভ্রমণ সহজ-সাধ্য ছিল না। তবুও পিতা পুত্র স্নেহে অন্ধ হইয়া তীর্থ-যাত্রীদের মাধ্যমে, কখনও নিজে যাইয়া খোঁজ-খবর নিতে লাগিলেন। কিছু কিছু আভাস পিতা-মাতা আগেই পাইয়াছিলেন যে এই ছেলেকে সংসারে বন্দী করিয়া রাখা যাইবে না। তবে ছাত্রাবস্থায় এইভাবে উধাও হইবে এমনটা ভাবিতে পারেন নাই। ভারতের উত্তরাঞ্চলে দুই বা ততোধিক ছেলের মধ্যে একটি সাধু-সন্ন্যাসী হইত এবং মা-বাবা গর্ববোধ করিতেন। এতদ্দেশে ছেলে সাধু-সন্ন্যাসী হওয়া পরম দুঃখের কারণ।

হরিবোল বাবার সঙ্গে ভারতের বহুতীর্থ, হিমালয় পরিভ্রমণ করিয়া রমেশ কাশীতে আসিয়া শ্রীশ্রীআনন্দময় ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। এখানে কিছুকাল থাকিয়া দীক্ষা নিয়া সাধন ক্রিয়া শুরু করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধপীঠ পঞ্চবটী তলায় গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া মাত্র ১৭ বৎসর বয়সেই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও কৃপালাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন। ঠাকুর মৌন থাকিতেন এবং ক্রমান্বয়ে বার বৎসর মৌন ছিলেন। তাই স্থানীয় লোকেরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া নাম না জানা যুবক সাধুর নাম দিল 'মৌনীবাবা''। গঙ্গার তীরে জঙ্গলের মধ্যে বড় একটা গাছের নীচে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় লইয়া সাধু গোপনে থাকিতেন। তবুও কিছু লোক সাধু দর্শনে যাইয়া জ্বালাতন করিত। শ্লেটে বা কাগজে খুশী হইলে কাহারও প্রশ্নের জবাব বাংলা কিংবা ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া দিতেন।

মায়ের মন্দিরে পূজারী তালা দিয়া রাত্রে বাড়ীতে চলিয়া যান। হঠাৎ এক উৎপাত শুরু হইল। সারা ঘরে মায়ের প্রতিমা ও ঘটে কে যেন রোজ রাত্রে নির্ম্মাল্য ফুল বেলপাতা ছড়াইয়া রাখে। অথচ বদ্ধ মন্দিরে ঢুকিবার কোন রাস্তা নাই। রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পাহারা

বসানো হইল এবং একদিন চোর ধরা পড়িল। পূজারী ও অনেকেই দেখিলেন এক সাধু শূন্যে বসিয়া নির্ম্মাল্য ছিটাইয়া মায়ের পূজা করিতেছে। ক্ষণকাল পরেই সাধু অদৃশ্য হন এবং বাইরে হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সাধু কিভাবে মন্দিরে ঢুকিল এবং বাহির হইল কেহই বুঝিতে পারিল না। তবে সাধু যে মহাশক্তিধর এইকথা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না। পূজারী ও সঙ্গীরা সাধুর পিছনে পিছনে ধাওয়া করিয়া ঠিকানাটা দেখিয়া আসিল।

মা ভবতারিণী পূজারীকে স্বপ্নাদেশ করিয়া বলিলেন সাধুকে একটু থাকার ব্যবস্থা ও রোজ তুপুরে ভোগের প্রসাদ যেন দেওয়া হয়। আদেশ পাইয়া সাধুর জন্য ব্যবস্থা করা হইল। সাধু প্রচার প্রতিষ্ঠা চান না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। একটু সুখ পাইয়া অশান্তি বাড়িয়া গেল। মায়ের নির্দ্দেশে যোগ সাধনার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং অবশেষে ঋষিকেশে যাইয়া একটি আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের কাছে যোগক্রিয়া শিক্ষা করেন।

হঠ্‌যোগের কঠিন হইতে কঠিনতম ক্রিয়া অভ্যাস করিয়া রাজযোগেও সিদ্ধিলাভ করেন এবং আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কিছুকাল শান্তি কুটীরে বাস করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তাঁহার কাছে যোগক্রিয়া শিক্ষা করেন। এই সময় তাঁহার মৌনভঙ্গ হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার ক্ষমতা তো সকলের নাই।

এদিকে পিতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্র নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন শ্রীগুরুচরণে জগতের মঙ্গলের জন্য। পিতা হারানো ধন বুকে পাইয়া পরম আনন্দিত। জগদ্‌গুরু মনে মনে হাসিলেন অন্য কারণে। গুরু শিষ্যকে সাধনের সহায়তার জন্য নায়িকা গ্রহণের আদেশ দিয়া পিতার সঙ্গে গৃহস্থাশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। গুরু আনন্দময় ব্রহ্মচারীও কিছুদিন পরে শ্রীহট্টে আসিলে ঠাকুর পরিবারের অনেকে এবং আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের বহুলোক দীক্ষা লাভ করিল।

ঠাকুর পরিবারে আনন্দের জোয়ার বহিতেছে। গ্রামবাসীরা সেই হারানো বালক রমেশকে সিদ্ধপুরুষরূপে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা। গৃহ উজ্জ্বল করিয়া পরমাসুন্দরী শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দেবী সিদ্ধপুরুষের সহধর্ম্মিনীরূপে আসিলেন। "নারায়ণের অঙ্গসাজে লক্ষ্মী খুশী আজ, শ্মশানবাসী শিবের সাজে সতীর নাইকো লাজ"। যোগী রমেশচন্দ্র গুরুদত্ত নাম "সচ্চিদানন্দ নাথ" যোগ সাধনেই অহর্নিশ ব্যস্ত। কোথায় কার সংসার? বাসর শয্যা ও শ্মশান যাঁর কাছে সমান।

এদিকে নব পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বে কত স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এখন প্রশ্ন জাগিল— এ কোথায় আসিলাম? কেন আসিলাম? তবে কি জীবনটা মাটি হইয়া যাইবে? 'দাম্পত্য সুখ' বলিতে যাহা বুঝায় সতীর ভাগ্যে তাহা কখনও জোটে নাই। অথচ তিনি লাভ করিয়াছেন অনেকগুণ বেশী। তিনি পরাজয় স্বীকার করিবার পাত্রী ছিলেন না। সতীর মত পণ করিয়া ভোলা শিবকে তাঁহার রুচি অনুযায়ী সেবাতে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। মহাসাধক সহধর্ম্মিনীর সহায়তায় মহাসিদ্ধি লাভ করিলেন। আর সহধর্ম্মিনীও তিনপুত্র এবং এক কন্যার জননী হইয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়া গেলেন। অন্তিমকাল পর্যন্ত সংসারের সকল কর্তব্য, সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা কোন কিছুর ত্রুটি করেন নাই। কষ্ট করিয়াছেন অনেক তবে প্রসন্ন চিত্তে। স্বামী কিছুকাল পরেই সংসার হইতে বিদায় লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। কঠোর তপস্যায় কিছুকাল নিমগ্ন থাকিয়া ভগবানের নির্দ্দেশে বৃন্দাবনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময় রাধাকুণ্ড-বাসী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য প্রেমসিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর গোস্বামীর কাছে যুগল ভজনের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভে পূর্ণকাম শ্রীশ্রীরমেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী লোকালয়ে পতিতপাবন সদ্গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

যাহার যেমন প্রয়োজন সেই অনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কেউ তন্ত্রে, কেউ যোগে আবার কেউ মন্ত্রযোগে। শক্তিমন্ত্র,

ব্রহ্মমন্ত্র ও কৃষ্ণমন্ত্র সবই দিতে লাগিলেন। সকলকে বলিতে লাগিলেন—"কেবল কৃষ্ণনাম, হরিনাম কীর্তন করো-ইহাতেই মঙ্গল হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ভক্তদের ও যোগক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। কাহাকেও প্রেমের ঠাকুর বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার এককথা মানুষ এক, ধর্ম্ম এক, ঈশ্বর এক। তোমরা মানুষ হও তখনই জানিতে পারিবে তুমি বা তোমরা কে?

কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড্ মাইকেল স্কট মাঝে মাঝে ঠাকুরের দর্শনে যাইয়া পরমশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন। বহু মুসলমান পীর, ফকির এমন কি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ঠাকুরের দর্শনে যাইয়া উপদেশ শুনিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছেন। একবার দুইজন মুসলমান মহাত্মা রাণীবাড়ী আশ্রমে গিয়া মুখে কোন কথা না বলিয়া বেশ কিছুক্ষণ ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঠাকুর ও একদৃষ্টিতে তাহাদের দেখিলেন। কথাবার্তা অন্তরে অন্তরে কি হইল অন্য কেউ জানিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে গুরুদাসীকে নির্দ্দেশ দিলেন, "ওদের প্রসাদ দে"। ওরা মুসলমান প্রসাদ গ্রহণ করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা পরম আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রসাদ লইয়া বিদায় লইলেন। যাওয়ার সময় আবার ঠাকুরকে নমস্কার জানাইয়া গেলেন পরম শ্রদ্ধাভরে। বলিয়া গেলেন, "এখানে যাহা দেখিলাম, যাহা পাইলাম, আর কোথাও এমন নাই।

অনেক পরলোকবাসী ও ঠাকুরের কাছে আশ্রয় লইয়া আবার দীক্ষা লইয়া ক্রমমুক্তির পথে বিচরণ করিতেছেন। সামাজিক অশান্তি হইবে ভাবিয়া নাম প্রকাশ করা হইল না, তবে এর মধ্যে অনেক স্বয়ম্ভু অবতার মহাপুরুষ ও আছেন।

॥ তিন ॥

দেশ বিভাগ হইল স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে। পৈত্রিক ভিটা মাটি ছাড়িয়া শ্রীমতী মানদা সুন্দরী দেবী তিন পুত্রকে লইয়া ভারতের অন্তর্গত করিমগঞ্জের রাণীবাড়ী গ্রামে আশ্রয় নিলেন। কন্যাটি আগেই

পরলোক গমন করে। কঠিন জীবন যুদ্ধ শুরু হইল। অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা থাকার একটু জায়গা, ছেলেদের লেখাপড়া ইত্যাদি ব্যাপারে মা ঠাকুরাণী বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বিপদে ধৈর্য্য হারাইতে নাই। মাতা ঠাকুরাণীর বিশ্বাস ছিল ভগবান ও মহাসিদ্ধ স্বামীর উপর। এই সংবাদ ঋষিকেশ আশ্রমে অন্তর্যামী শিবস্বরূপ স্বামী জানিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগী অবধূত সন্ন্যাসী শিষ্যদের লইয়া প্রথমে কলিকাতা ও পরে রাণীবাড়ী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। শোভাবাজার রাজ পরিবারের পরম গুরুভক্ত শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র এবং আরও কয়েকজন ধনী শিষ্যের সাহায্যে কিছু টীলা ও ক্ষেতের জমি খরিদ করিয়া ১৯৪৯ ইংরাজীতে আশ্রম নির্ম্মাণ করা হইল। অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা হইয়া গেল। ছেলেরা ও পড়াশুনা শুরু করিয়া দিল।

ঠাকুর কয়েকজন সংসার ত্যাগী শিষ্যসহ রাণীবাড়ী আশ্রমে কিছু-দিনের জন্য থাকিয়া গেলেন। গুরুমা এবং ছেলেরা খুশী হইলেন। তবে শুরু হইল এক অদ্ভুত কাণ্ড। অযাচিত দীক্ষা, প্রেমভক্তি লাভ করিয়া অনেক মানুষ কৃত কৃতার্থ হইয়া গেল। আবার অনেকের অন্ন সংস্থান ও পয়সা রোজগারের পথ খুলিয়া গেল সাধুর কৃপায়।

আশ্রমে তৈরী হইল ধুনীর ঘর, টিনের চাল, টিনের বেড়া। ভিতরে সারা ঘরে ছোটবড় অসংখ্য ধুনী। বাহিরে টিলাতে ও নানা জায়গায় ধুনী। সর্ব্বমোট ৫৬টি ধুনী সারাদিন-রাত জ্বলিত। ইন্ধন ধানের তোষ ও কুড়া। কৃষি প্রধান এলাকা। তাই তোষ ও কুড়ার যোগানদার গ্রাম-বাসীরা ও মিলমালিকরা পয়সার বিনিময়ে। ব্রহ্মচারী শিষ্য কয়েকজন মাথায় করিয়া তোষ ও কুড়ার বস্তা বহিয়া নিয়া আসেন। কয়েকজন শ্রমিক এইকাজে নিযুক্ত করা হইল। গুরুসেবা চলিতেছে। কোন কোন ভক্ত অতিষ্ঠ হইয়া পলায়ন করিলেন। ধুনীর ঘরে এতসব জ্বলন্ত ধুনীর মাঝখানে বসিয়া গ্রীষ্ম বর্ষার গরমের দিনে রাতে ঠাকুর পরমানন্দে আহুতি করিয়া চলিয়াছেন। আগুনের তাপে সোনার অঙ্গ কালো হইয়া গেল। কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। এই ক্রিয়ার নাম বুঝি পঞ্চতপা। পরে জানিতে পারিয়াছি। ভোগের দ্রব্য ফলমূল সবই আহুতি দিতেছেন।

কখন ও একটু ভোগ গ্রহণ করিতেন। কখনও বা ভস্ম জলেগুলিয়া পান করিতেন। এই কাণ্ড কারখানা দেখিয়া লোক অবাক হইয়া যাইত। নাম পড়িয়া গেল "তোষসাধু"। কোন কোন বহির্মুখী পাষাণ্ড পাগল আখ্যা ও দিয়াছে। পাগলা শিবের নাচনে যেসব ভক্ত নাচিত, তাহাদের জন্য রাণীবাড়ী আশ্রম কৈলাসপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। কত দীন দুঃখীর ভাগ্য খুলিয়াগেল ঠাকুরের প্রেমস্পর্শে।

১৯৫০ ইংরাজীর দাঙ্গার সময় পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে আমরা ও উদ্বাস্তু হইয়া রাণীবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। তখনকার কষ্টের দিন ভুলিবার মত নয়। প্রসাদ পাওয়ার লোভে মাঝে মাঝে আশ্রমে যাইতাম। কিছু কিছু কাজও করিয়া দিতাম। তখন তো গুরু হন নাই। দাদুর আবদারেই যাইতাম। আমার ও পড়াশুনা বন্ধ। আশ্রমে অনেক মজদুর কাজ করিত। আমি ও কিছুদিন কাজ করিলাম। রোজ পাইতাম ৭৫ পয়সা। চিড়া, মুড়ি, চা প্রসাদ যখন যাহা মজদুরদের ভাগ্যে জুটিত আমি ও পাইতাম। অন্তর্যামী হয়ত মনে মনে ভাবিতেন এ তো মজদুর নয় আমার চিরকালের সেবক। পরবর্ত্তী সময়ে দীক্ষা লাভের অনেকদিন পরে হঠাৎ ঠাকুরের হাতে লেখা একখানা কার্ড পাইয়া তো অবাক হইয়া গেলাম। লিখিত নির্দ্দেশ, "এখন হইতে তুমি 'গুরুদাস' লিখিও"। কত জন্মের সুকৃতি থাকিলে গুরুদাস হওয়া যায়। আমার মানব জন্ম সার্থক এবং গুরুদাস নাম সার্থক তখনই হইবে যখন আমার গুরুর প্রতিষ্ঠা হইবে সমাজে এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ আমার প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৯৫১ ইংরাজীতে ঠাকুর রাণীবাড়ী আশ্রম ত্যাগ করিয়া আবার কলিকাতা হইয়া ঋষিকেশ চলিয়া গেলেন। গাড়োয়ান, কুমায়ুন, পাঞ্জাব, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, দ্বারকা, হরিদ্বার, কাশী এবং দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকালে কত ধনী, দরিদ্র, জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে মানব দরদী প্রেমের ঠাকুর শিক্ষা-দীক্ষা দান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলাতে গ্রামে, গঞ্জে কত লোককে

অযাচিত দীক্ষা-শিক্ষা দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে দুঃখের বিষয় যাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিয়াছে; সকলেরই প্রভূত অমঙ্গল ঘটিয়াছে। গুরুগিরি তাঁহার ব্যবসা ছিল না। দক্ষিণা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতেন না। আমরাও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দিই নাই। শুধু একবার মাত্র পা ছুঁইয়া প্রণাম করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। শিষ্যকে নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত যে গুরু, দীক্ষার কোন আয়োজন আড়ম্বর নাই, স্থান কালের বিচার নাই, এমন কি দক্ষিণার ও দরকার নাই। দীক্ষা দান অতিসহজ। "কেবল নাম জপ করবি। আর কিছু করতে হবে না। "কিংবা" আমার ওঁকার সাধন কর, এতে শক্তিলাভ হবে। মিথ্যাকথা বলবি না"। এত সস্তায় দীক্ষা শিক্ষা সকলের মনঃপুত হয় না। তাই অনেকে আবার বড় নামীদামী প্রতিষ্ঠান ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ গুরুর আশ্রয়ে যাইয়া যথারীতি দীক্ষা নিয়াছে। এইসব ঘটনা নিজেই আমার কাছে প্রকাশ করেন। আমার এত গুরুভক্তি নাই। তার উপরে সম্পর্কে দাদু, আমিতো রাগিয়া যাইতাম গুরুর উপর। সস্নেহে আমাকে শান্ত করিয়া বলিতেন, "ওরে, ওরা যে মূর্খ। যার জ্ঞান আছে সে এমন ভুল করবে না। লক্ষাধিক মানুষকে দীক্ষা দিয়াছি। আমিতো রোজগারের ধাঁধায় শিষ্য তালিকা লিখিয়া রাখি নাই। মানুষের সেবা করিতে আসিয়াছি। সেবা করিয়া যাইব। আমি মানুষের সেবক। গুরু নই। গুরু একজন পরমেশ্বর"। এরপর আর কি বলিতে পারি। সহ্য করিয়া যাইতাম। দুঃখ হয় শিবস্বরূপ গুরুকে কেহ চিনিল না।

কলিকাতায় অবস্থান কালে একবার গুরুমা পুত্রদের নিয়া গেলেন এবং কিছুদিন খুব সমাদরে থাকিয়া দেশে ফিরিলেন। ঠাকুর আপন পত্নীকে জগজ্জননীরূপে পূজা করিলেন। টালীগঞ্জের শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাধু প্রমুখ শিষ্য ভক্তরা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবাবেশে ঠাকুর পত্নীকে 'মা' সম্বোধন করিতেন। আমার মত দুষ্টরা খুব ক্ষেপাইতাম। কিন্তু বড়দি (গুরুমা) বলিয়াছেন এই

সম্বোধনে তাঁহার মধ্যে বাৎসল্য ভাব জাগিয়া উঠিত। বাহিরে তিনি লজ্জাবোধ করিলেও অন্তরে অন্তরে খুশী হইতেন।

রাণীবাড়ী আশ্রমে জেষ্ঠ্যপুত্র শ্রীযুক্ত রজত কান্তি চক্রবর্তী গার্হস্থ্য জীবন শুরু করিয়া পারিবারিক দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্র চক্রবর্তী শিক্ষালাভ করিয়া সরকারী চাকুরী জীবন শুরু করেন। ঠাকুর স্থূলদেহ থাকা অবস্থায় সকলেই বিবাহ করেন। সুখের সংসার বলা যায়। দুঃখ শুধু পিতা বর্তমান থাকিয়াও সংসারত্যাগী।

॥ চার ॥

১৯৬৭ সাল শ্রীশ্রীঠাকুরের নরলীলার এক স্মরণীয় অধ্যায়। সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর পরে ঠাকুর হঠাৎ রাণীবাড়ী আশ্রমে আসিয়া কিছুকাল পরিবার পরিজনের সঙ্গে বসবাস করেন। সকলেই খুশী হইলেন এবং আশা করিলেন এইবার হয়তো পুত্রবধূর সেবায় ও নাতিনাতনীর আবদারে এখানেই থাকিয়া যাইবেন। লীলাময়ের লীলা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নয়। এই আগমনের পিছনে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল এবং ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে।

মায়ের অন্তিম শয্যার টেলিগ্রাম পাইয়া সস্ত্রীক শিশুকন্যা রঞ্জনাকে লইয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রে রাণীবাড়ী পৌঁছিলাম। আমাদের বাড়ী হইতে ঠাকুরের আশ্রম বেশদূরে। পরের দিন ভোর ৬টা নাগাদ আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলেই অবাক। তিনি কেমন করিয়া জানিলেন আমরা বাড়ীতে গতরাত্রে পৌঁছিয়াছি। আমি মায়ের বিছানায় বসিয়া তখন চা খাইতেছি এবং গল্প করিতেছি মায়ের সঙ্গে। যাই হউক বারান্দার চেয়ারে তাঁহাকে বসাইয়া আমরা প্রণাম করিলাম। মা ও খুব খুশী মামা ও গুরুকে দর্শন করিয়া যদিও তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই। ঠাকুর আমাদের কুশলাদি, কোথায় থাকে, কি চাকুরীকারী, বেতন কত পাই ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপরই বলিয়া উঠিলেন, "তোর বউকেও ডাক। আমি তোদের দীক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছি এখন।

গতরাত্রে প্রভু আমাকে জানাইলেন তোরা আসিয়াছিস্ তোদের এখন দীক্ষা নেওয়ার দরকার এবং দীক্ষা আমার কাছেই হইবে। আমি তোর সদ্গুরু। আর দেরী করিস্না, বউকে ডাক এবং বসে পড়"। কিছু-দিন যাবৎ বেশ ঝামেলা, শারিরীক কষ্ট ইত্যাদি চলিতেছে। আমার স্ত্রী শ্রীমতী শেফালিকা দেবীর বুদ্ধি ছিল দীক্ষা নিলে নাকি অশান্তি দূর হয়। মনের মত গুরু পাই না। অনেক সম্প্রদায়ে ঘুরিয়াছি। বইপত্র পড়িয়াছি। ধর্ম্ম ব্যবসায়ী এজেন্টদের পাল্লায় পড়িয়া হয়রান হইয়াছি। ঝগড়া বিবাদ ও করিয়াছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা, যদি আমার গুরুকরণের একান্ত প্রয়োজন থাকে তবে আমার গুরু আমার কাছে স্বয়ং আসিয়া আমাকে পরমার্থ পথ প্রদর্শন করিবেন। আমি আর কোথাও যাইব না।

মনের ভাব গোপন রাখিয়া দাদুভাইকে বলিলাম, আমি দীক্ষা নিতে পারিনা আপনার কাছে। আমার দীক্ষার প্রয়োজন নাই। আমার স্বপ্নের গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ছেলেবেলা হইতেই আমি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত। তিনি বলিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ তো এখন স্থূলদেহে নাই তবে দীক্ষা নিবি কারকাছে? সাক্ষাৎভাবে সদ্গুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হয়। আমি তোর সদ্গুরু"।

মনে মনে ভাবি কুলদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণ বোধ হয় আমার প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়া দাদুভাইকে আমার সদ্গুরু রূপে পাঠাইয়াছেন। মৃত্যুপথ যাত্রী জননী বারবার বলিতে লাগিলেন, "ওরে ঠাকুর মামা মস্ত বড় মহাপুরুষ। আমাদের সকলের গুরু, তুই আপত্তি না করিয়া দীক্ষা নে বাবা। তোর মঙ্গল হইবে। আমি তোর মা, তোর ভালই চাই। তবুও আমি কুতর্ক করিতে লাগিলাম। গুরু ও নাছোড়বান্দা। দীক্ষা দিয়াই যাইবেন। আমি বলিলাম, 'আমিতো গায়ত্রী জপ করি, দুর্গা ও নারায়ণের বীজমন্ত্র জপ করিতেছি প্রায় ১৭ বৎসর যাবৎ। রামদাস কাঠিয়াবাবা একলক্ষ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর দর্শন লাভ করেন। আমিও তাই করিব এবং শাস্ত্রঅনুসারে পরমপদ লাভ হইবে। সুতরাং দীক্ষার দরকার কি? ঠাকুর বলিলেন, "তোর সব কথাই ঠিক তবুও নিয়মানুসারে মানবগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়

এবং মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ হয়। আমার কাছে তুই এখনও বালক; এইসব বুঝবি না। তোর মা আমার কোলে পিঠে কত উঠিয়াছে,,। তবুও আমার মন গলে না। আবার কুতর্ক। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলেন– "শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সাক্ষাৎভাবে দীক্ষা নিলে যে ফল হইত রমেশ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিলে তোমার সেই ফলই হইবে। আমার প্রভুর কত কাজ ফেলিয়া আসিয়াছি তোর জন্য। কত মূল্যবান সময় আমার নষ্ট করলি তুই"। আর সহ্য করিতে পারিলাম না। ভিতর হইতে অন্তরাত্মা সহসা জাগিয়া উঠিল, বলিলাম, ঠিক আছে আমি স্নান করিয়া আসি। চার দিনের মধ্যে স্নান করিনাই। শরীর, কাপড়চোপড় অশুদ্ধ"। বলিলেন, "না, স্নান করিতে হইবে না। গঙ্গাস্নানে গেলে পুকুরের জলে ডুব দিয়া পরে কেউ গঙ্গাস্নান করেনা। পতিত পাবনী গঙ্গার স্পর্শে শুদ্ধ হইয়া যায়, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ দূর হইয়া যায়, তেমনি সদ্গুরুর স্পর্শে শিষ্যের অন্তর বাহির শুদ্ধ হইয়া যায়"। আর কোন কথা না বলিয়া বসিয়া পড়িলাম। দুইকানে মন্ত্র শুনাইলেন। একটা প্রণাম করিলাম পা ছুঁইয়া। ঠাকুরের স্পর্শে শরীর ও মনে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিতে লাগিল। আমার স্ত্রীকে ও দীক্ষা দিলেন।

আমার দীক্ষা গ্রহণে মা এবং পরিবারস্থ সকলেই খুশী হইলেন। এইরূপ দীক্ষাগুরুও শিষ্যে লড়াই বোধ হয় আর কারও জীবনে হয় নাই। দক্ষিণা দিতে হইবে না? "দিবি, তবে এখন না, সময়মত চাহিয়া লইব"। খুব হাসিলেন পাগল নাতিকে দীক্ষা দিয়া। আজ জাত-সাপের ছোবল পড়ল তোর উপর। কোন ওঝার সাধ্য নাই এই বিষ ঝাড়িয়া নামায়"। মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিলাম না। ঠাকুর খুশীমনে বিদায় লইয়া আশ্রমে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণও মাকে প্রণাম করিলাম। মার অন্তিম ইচ্ছাপুর্ণ হওয়ায় খুব খুশী হইলেন। আমার মা ৺রাজবালা দেবী ঠাকুরের বড়দিদির প্রথমা কন্যা। বড়ভক্তিমতী ও ধর্মশীলা ছিলেন। রাত ১১ / ১২ টায় অতিথি আসিলে কিংবা দীন-দুঃখী আসিলে নিজের খাবার দিয়া সেবা করিতেন। কখনও বিরক্তি

প্রকাশ করিতে দেখি নাই। বলিতেন, "অতিথি বা দীন ভিখারীবেশে অনেকসময় ভগবানও ভক্তকে পরীক্ষা করিতে আসেন। তাই অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিতে নাই"। মায়ের ধর্ম্মকর্ম্মের ফলে আমরা দেশ ছাড়িয়া যখন বিপন্ন অবস্থায় ভারত পৌঁছিলাম তখনও আমরা ভিক্ষা করি নাই। একেবারে অনাহারেও দিন কাটাই নাই। অন্ততঃ দিনে না হউক রাত্রে মা পাতলা খিচুড়ী রান্না করিয়াও আমাদের মুখে অন্ন দিয়াছেন। নিজে নামমাত্র মুখে দিয়া পেট ভরিয়া জল খাইয়াছেন। অথচ মাকে কখনও বিষণ্ণ মনে হইত না। বাবাকে কখনও কটুকথা বলিতে শুনি নাই। আমাদের ভাগ্য মন্দ বলিয়া মাকে অকালে মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে হারাইলাম ১৯৬৭ সালে।

আমার পিতা ৺কামিনীমোহন ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সৎ ব্রাহ্মণ কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের যথার্থ সেবক অতিথি পরায়ণ, পরদুঃখে কাতর ও পরম গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুদেব বাবাকে খুব ভালবাসিতেন তাঁহার সততা এবং ধার্মিক বিচার বুদ্ধির জন্য। ঠাকুর একদিন বলেন, "তোর বাবা ও মা আমার কাছেই আছে"

আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত রূপেশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও ভ্রাতৃবধু ৺সুলোচনা দেবী অনেক আগেই ঠাকুরের কাছে দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহাদের গুরুভক্তি অসাধারণ। যাই হউক আমার দীক্ষাগ্রহণে সকলেই খুশী হইলেন। কিন্তু আমার একদিকে আনন্দ যে আমার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ গুরুরূপে আসিয়া আমাকে চরণে আশ্রয় দিয়াছেন, অন্যদিকে শরীর ও মনের উপর বেশ প্রতিক্রিয়া অনুভব করিলাম। সারাদিন যেন কিরূপ আনমনা হইয়া কাটাইলাম। অতি প্রিয় আদরের প্রথম সন্তানটিকে পর্য্যন্ত কোলে নিতে ইচ্ছা হইল না। সংসার যেন আমার মন হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। আবার ভাবি সাধু যাদু করেন নাই তো? বাধ্য হইয়া মাকে এই ভাবান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মার মৃত্যু আসন্ন; কেবল দিন গুনিতেছেন, কিন্তু গুরু কৃপায় শরীর অবসন্ন হইলেও ভিতরে সম্পূর্ণ জ্ঞান আনন্দে ভরপুর। মার মুখে গুরুমহিমা, গুরুতত্ত্ব শুনিয়া তো আমি অবাক। মা বলিলেন, "যাদু নয় বাবা, মহাপুরুষের দীক্ষায় এইরূপ হয়। শক্তি সঞ্চালন করিয়া

দীক্ষা দিলে অনেকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতে শুনিয়াছি। তোর ভাল হইবে চিন্তা নাই।

সারাদিন পাগলের মত কাটাইয়া রাত্রের অন্ধকারে আশ্রমে গেলাম মার কথামত। লজ্জাও আছে যেহেতু সকালবেলা দীক্ষা নিতে গিয়া গোলমাল করিয়াছি এখন নিজেই গেলাম সাধু কাছে মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য। বাহিরে ইতস্তত: করিতেছি ভিতরে ঢুকিব কিনা, অন্তর্যামী প্রেমময় ঠাকুর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে দেখ্‌তো বাইরে বোধহয় কেতকী আছে। ভিতরে নিয়া আয়।" ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও নিষ্ঠাবান গুরুভক্ত ৺পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী আমাকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন। প্রণাম করিয়া বসিলাম। ঠাকুর চায়ের আহুতি দিতেছেন। শিষ্যদের উপদেশ দিতেছেন গীতা ও উপনিষদ্‌ হইতে। চায়ের প্রসাদ একটু আমিও পাইলাম। "উপদেশ শুনিয়া যাও, শুনিলে উপকার হয়। একদিন তোমাদের কাজে লাগিবে। সস্তায় মাত্র একটাকা আট আনাতে গীতা পাওয়া যায় একখানা খরিদ করিয়া নিবে এবং রোজই একটু পাঠ করিবে।"

আলোচনা চলিতেছে এমন সময় কালো রং-এর একটা সাপ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়াতে হৈ-চৈ শুরু হইয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন কেউ নিশ্চয়ই ছুঁইয়া আসিয়াছ। ধুনী হইতে একটু ভস্ম লইয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন সাপটি মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। আমাদের তো ভয়ের অন্ত নাই। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমরা বাহির হইব এমন সময় ঠাকুর আমাদের হাতে একটু একটু ভস্ম দিয়া বলিলেন "ভয় নাই তোমাদের, রাস্তায় অন্ধকারে সাপটিকে মাড়াইয়া গেলেও ছোবল মারিবে না।" আমরা নির্বিঘ্নে যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। দীক্ষার প্রথম দিনেই ঠাকুরের একটু বিভূতি দর্শনে এবং উপদেশ শ্রবণ ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া একটু বিশ্বাস হই যে সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি। সেইদিন হইতেই গুরুকে নানাভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। বিনামূল্যে, বিনাশ্রমে সদ্‌গুরু লাভ। তা ছাড়া আমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইবে কিনা এই গুরুর দ্বারা। শিষ্যের হয়ত এরূপ করা উচিত নয়। জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া এখন কত অনুশোচনা হয়।

আমার গুরু ভোলাশিব যে বারোমাসে একদিন স্নান করেন না ; সমস্ত শরীরে ভস্মমাখেন, যাঁর মনে অপমান বোধ নাই, আমার মত মূর্খ চেলার পরীক্ষায় তাঁহার কিছু হইবার নয়। আজ চোখের জল আট্‌কাইতে পারিনা যখনই তাঁহার স্নেহমাখা মুখশ্রী মনে পড়ে। আমার প্রয়োজনে কি তাঁহার প্রয়োজন জানিনা, তবে বহু বিষয়ে আমার অন্যায় আবদারকে ও তিনি প্রশ্রয় দিয়া আমার অহঙ্কার বাড়াইয়াছেন।

গুরু যখন চেলা তৈরী করেন, তখন প্রথম দিকে গুরু হন শালা। শিষ্যের বিশ্বাস পাকা হইয়া গেলে গুরু হন রাজা এবং শিষ্য দণ্ডভোগী প্রজা। আমার বেলা তাই হইয়াছে। পাষণ্ডকে তালিম দিতে গিয়া গুরুকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। আর এখন শাস্তিস্বরূপ আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া চলিতে হইবে যতকাল স্থূলদেহে আছি। এখন গান লিখি, গান গাই – "চাও যদি মন ভবপার, গুরু কারো সার। গুরুর মত এমন দয়াল, ভবের হাটে নাইরে আর। সদা চিন্ত গুরু নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, জুড়াবেরে ত্রিতাপ জ্বালা, রবে না অজ্ঞানাধার"।

কিংবা

যার ভাগ্যে হয় গুরুকৃপা
করে শ্রবণ নাম অজপা,
প্রেমভক্তি রসে মজি
অন্তিমে পায় গুরুধাম॥

নিজের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যখন শেষ হইয়া গেল তখনই আসিল শরণাগতি শ্রীগুরুপদে। কতটুকু হইয়াছে জানিনা তবে গান লিখিলাম—

দেহতরী দিলাম ভাসাইয়া
বন্ধু অকূল দরিয়ায়,
সঁপেদিয়ে ভবের জঞ্জাল
দয়াল গুরুর পায়॥

চঞ্চলমন মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া যায়। আর্ত্তকণ্ঠে আবার গাইলাম—

"ওগো জীবন দেবতা
গুরু পরম দেবতা,

জ্বালিয়েছ যবে আশার আলো
নিভিতে দিওনা ॥
অজ্ঞান তিমিরে ক্ষীণ আলোরেখা
উঠিবে কি জ্বলে দীপ্ত দীপ শিখা,
মনের আকাশে কালো মেঘ ছায়ে
জাগে প্রাণে বেদনা ॥
(ওগো জীবন দেবতা)
তুমি ধর যারে উদ্ধার তাহারে
ভয় নাহি তার জগত মাঝারে,
সত্য যদি মানি মহাজন বাণী
করো মোরে করুণা ॥
(ওগো জীবন দেবতা)

গুরু হার মানিবার পাত্র ছিলেন না। নাচাইতে লাগিলেন। আজও নাচাইতেছেন। জানিনা কোন জন্মে এই নাচ থামিবে। স্থূলদেহে থাকিতে অন্তরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আর এখন ইঙ্গিতে বলিতেছেন,—

তরী বাইয়া যাওরে
ওঁকার ধ্বনি দিয়া
উজানী নগরে তোমার
প্রেমিক রইছে বইয়া
ডাকে হাতছানি দিয়া ॥
জীর্ণতরী চলছ বাইয়া
দীর্ঘকাল ধরিয়া
প্রাণের বন্ধুরে পাইলে জ্বালা
যাবেরে ভুলিয়া
নতুন জীবন পাইয়া ॥
ভয় প্রলোভন পথের বাধায়
যাও যদি থামিয়া

অন্তঃকালে কূল পাবে না
কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
হৃদে বাজে প্রেমের বাঁশী
শুন মন দিয়া
ব্রজ গোপীর ভাবরঙ্গে
চলেরে নাচিয়া
গুরু অনুগত হইয়া ॥

আবার এক শুভ ইঙ্গিত—

অন্তরে বাজে গো বীণায়
গুরুব্রহ্ম নাম
বিবিধ নিনাদে বাজে
অজপা নাম ॥
বাজে ভ্রমর ধ্বনি
মৃদঙ্গ মাদল ভেরি,
সুললিত কিঙ্কিণী
মনোমুগ্ধকারী।
মৃদু মধুসুর তানে
আনন্দ উথলে প্রাণে,
হৃদি-মাঝে ফুটে যেন
চিদানন্দ ধাম ॥
এ যেন সেই বাঁশী
কদম্বের ডালে বসি
বাজাইত শ্যামরায়
প্রেম ছলনায়।
বাজে বাঁশী রাধা বলে
সকরুণ ছন্দে,

অভিসারে চলে রাই
মিলন আনন্দে।
বাঁধ ভেঙ্গে ছোটে বান,
কূলছেয়ে উজান,
অনন্ত বারিধি বক্ষে
লভিতে বিরাম ॥

কয়েকদিনের সদ্গুরু সঙ্গলাভে বুঝিতে পারিলাম আত্মার আত্মীয়, নিঃস্বার্থ বন্ধু যদি জগতে থাকেন তবে তিনি সদ্গুরু। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি তো অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আমি যুবক, আমার যখন সাধন ভজনের প্রবল ইচ্ছা জাগিবে তখন আপনি থাকিবেন না। আমাকে আবার কোন সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজে বাহির হইতে হইবে। কতটুকু কি হইবে বুঝিতেছি না।" হাসিয়া জবাব দিলেন – "নারে আমি মরিব না, আমার মৃত্যু নাই। হ্যাঁ, এই স্থূল শরীর ছাড়িতে হইবে। আমি দেহে না থাকিলেও তোর অন্যত্র যাওয়ার দরকার হইবে না। যখন যাহা প্রয়োজন গুরুই দেন এবং ভিতর হইতে করাইয়া লন। তুই বালক এইসব এখন বুঝবি না।" গুরুর মৃত্যু নাই এই জ্ঞান আজ হইয়াছে। গুরুর মহিমা সর্ব্বদাই অনুভব করিতেছি।

যাহারে করেছি হেলা
তার জন্যে প্রাণে জ্বালা,
কেমনে লভিব তোমায়
কোন সাধনায়।

ছুটী শেষ হওয়ার আগে ভাবিলাম একদিন আমাদের বাড়ীতে গুরুসেবা করিব। ঠাকুর আহুতি দিবেন এবং একটু প্রসাদ পাইব। মা ও বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়া ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ জানাইলাম। রাজী হইয়া গেলেন। সমস্ত ভোগ্যবস্তু অগ্নিতে আহুতি দিলেন। সামান্য গ্রহণ করিয়া আমাদেরে প্রসাদ দিলেন। মা বিছানায় পরলোকে যাওয়ার জন্য দিন গুনিতেছেন। একটু আধটু তরল খাদ্য গ্রহণ করেন। আজ গুরুদেবের প্রসাদ খাইতে চাহিলেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার গুরুদেব বললেন, "তোর মাকেও প্রসাদ দে।

সুস্থ হইয়া যাইবে"। মা খুশীতে অনেক প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সেইদিন হইতে মা শারীরিক সুস্থ অর্থাৎ রোগ যন্ত্রণা নাই। ভিতরে অফুরন্ত আনন্দ। আমরা ভাবিতে পারি নাই যে মা আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। গুরুদেবও বলেন, "তোর মা ভাল হইয়া যাইবে"।

আমি কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলাম। মার বিশেষ অনুরোধে আমার ছোটভাই শ্রীমান কুণীরঞ্জনকে ছুটিতে পাঠাইয়া দিলাম। সে আমার সঙ্গেই থাকিত নাগাল্যাণ্ডের তুয়েনসাঙ্-এ, সে কিছুদিন মায়ের সেবা করিয়া চলিয়া গেল কর্ম্মস্থলে মা তাহাকে বলিলেন তিনি খুব আনন্দেই আছেন তবে পার্থিব শরীর ছাড়িয়া দিবেন। বাবা মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পার্থিব শরীর ত্যাগ করেন। ডিসেম্বরে মাও সজ্ঞানে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

শ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া গুরুদেবকে বলিলাম আপনার বাক্য তো মিথ্যা হইয়াগেল। আপনি বলিলেন— মা ভাল হইয়া যাইবেন তবে মরিলেন কেন? ঠাকুর স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিলেন পার্থিব শরীর ত্যাগ না করিয়া আনন্দলোকে নিত্যধামে যাওয়া যায় না। "তোর মা ও বাবাতো আমার দেহেই আছে। এরাতো আমার আপনজন। এখন এইসব বুঝবি না। তোরা ও একদিন আমার কাছেই আসবি"। তখন অবশ্য এইসব তত্ত্ব বিশ্বাস করার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তবে বুঝিলাম মা ও বাবা সদ্‌গুরুর কৃপায় উদ্ধার হইয়া গেলেন যদি শাস্ত্র মানিতে হয়। মা, বাবা স্বপ্নে দর্শন দিয়াছেন।

শুধু মানুষই নয়, গবাদি পশুর ও উদ্ধার করিয়াছেন মৌনীবাবা। আমার মায়ের পরলোক গমনের কয়েকদিন আগে রাণীবাড়ীতেই ঠাকুরের ৯৭ বৎসর বয়স্কা শ্বাশুড়ী পরিবার তথ গ্রামবাসীকে অবাক করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। মহাপুরুষ জামাতা এইক্ষেত্রে ও ত্রুটি করেন নাই। পরম ভক্তিমতী বৃদ্ধা পায়ে হাঁটিয়া গ্রাম পরিক্রমা করিয়া আমার মাকেও দেখিয়া আসেন যেহেতু আমার মা চলিয়া যাইবে। তাঁহার বড়মেয়ে (আমাদের গুরুমা) এবং আরও অনেককে দেখিয়া বাড়ীতে যান। দুপুরের খাওয়া শেষ হইয়াছে কিনা, সকলকে কাছে

ডাকিয়া সকলের হাতে জল চাহিলেন জল দেওয়া শেষ, বৃদ্ধার জীবলীলাও শেষ।

শ্রদ্ধের দিন আমি ছুটিতে ছিলাম গ্রামে, তাই সকলবেলা একটু দেখা করিতে গেলাম। যাওয়ার পথেই পড়ে ঠাকুরের আশ্রম গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু টিলাতে। ভাবিলাম একটু দর্শন করিয়াই যাই। এই কয়েকদিনে অজান্তে গুরুর প্রেমে পড়িয়া গেলাম। যাইতেই বড় খুশী হইয়া কাছে বসাইলেন। কোথায় যাওয়া হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, শ্রীযুক্ত সুধীর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে যাইব; আজ আপনার শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ কিনা"। ভাল কথা –"যা যা, তবে একটু গুরুসেবা করে যা"। কি করিতে হইবে? একটা ঘট ও এক বালতি জল নিয়া চল্, পায়খানায় যাইব"।

প্রভু আগে, ভৃত্য পিছনে পিছনে চলিতেছি, একটু যাওয়ার পরই থামিলেন – "বালতি রাখ্। আগে চল্ গোয়াল ঘরে। একটি বলদ অসুস্থ। একটু ওকে দেখি"। স্বাস্থ্যবান লাল রং-র প্রকাণ্ড হালচাষের বলদ দাঁড়াইয়া আছে। ওর কাছে যাইয়া ভোজপুরী ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন এবং গায়ে মাথায় গলায় হাত বুলাইয়া দিলেন। আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন, 'তুই সামনের দরজা বন্ধ করিয়া দিবি কিন্তু আমার সঙ্গে আসবি না"। যেমন হুকুম তেমনি কাজ। আবার একজায়গাতে মিলিত হইলে বলিলেন, চল জল লইয়া। পিছনে পিছনে চলিলাম। বলিলেন, "ওরে বলদটি এখনই মরিয়া যাইবে। বিদায় দিয়া আসিলাম"। "আপনি ভোজপুরী ভাষায় বলদের সঙ্গে কেন কথা বলিলেন? 'বুঝলিনা – ও যে বাংলা ভাষা বোঝেনা"। তারমানে? "গত জন্মে বিহারী ব্রাহ্মণ সাধক ছিল। গুরুর অভিশাপে গোজন্ম হয়। শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় গুরু বলিলেন – গোজন্ম অবশ্যই হইবে তবে কোন মহাপুরুষের আশ্রয়ে যাইয়া মুক্তি লাভ হইবে। এখন বুঝলি কিছু"?

আমি একটুও বিশ্বাস করি নাই। পায়খানা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বিদায় নিয়া শ্রাদ্ধবাসরে গেলাম। ঘটাখানেকের মধ্যেই ফিরিলাম যেহেতু

স্নান সারিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বেই ওখানে আবার পৌঁছিতে হইবে। আশ্রমের মুসলমান চাকর তরমিন আলী দুঃখের সহিত জানাইল বলদের মৃত্যুর ঘটনা। গ্রামের নিয়ম অনুসারে গরুগুলিকে গায়ে জল দিয়া যখন চরাইতে নিয়া যাইবে, হঠাৎ সেই বলদটি পড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। আমিতো রাস্তায় এই খবর শুনিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিলাম। এতবড় জীবন্ত সত্য ঘটনা যাহা বিশ্বাস করিনাই। গুরুর মহিমা মাকেও অন্যান্য সকলকে জানাইলাম। সকলেই সাধুর জয়গান করিলেন। বলদ উদ্ধার হইয়া গেল। আমিও সদ্‌গুরুর একটু পরিচয় পাইয়া গেলাম। আমার শিক্ষার জন্যই এইলীলা আমাকে সামনে রাখিয়া করিলেন দয়ালগুরু। নইলে হয়ত শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইত না। বলদের উদ্ধার আমাকে বড়বেশী অবিভূত করিল। গুরু যখন জোর করিয়া আমাকে ধরিয়াছেন, তখন আমার উদ্ধার অবশ্যই তিনি করিবেন। কিছু বিশ্বাস জন্মিল।

কয়েকদিন পরে ছুটি শেষ হইলে কর্ম্মস্থলে সপরিবারে চলিয়া গেলাম। মার শ্রাদ্ধের পরে আরেকদিন ঠাকুর আমাদের বাড়ীতে ভোগ আহুতি দিয়া আমাদেরে প্রসাদ দিলেন। বিশ্রাম করিতে করিতে হঠাৎ বলিয়া উঠেন, "ওরে দাদুভাই, দেখলাম ভবিষ্যতে তুই অনেক বইপত্র লিখবি। আমার বাক্‌সিদ্ধি আছে. মিথ্যা বলি না।"

কিছুদিনের মধ্যেই আমি বদলী হইয়া গেলাম মণিপুরের রাজধানী ভগবান কৃষ্ণার্জ্জুনের লীলাভূমি ইম্ফলে। খুব খুশী হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া গোবিন্দজীর মন্দির, হনুমানজীর মন্দির, রাজবাড়ী ও অন্যান্য দর্শনীয় ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করিয়া খুব আনন্দ হইল। আবার কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বি, এ, ডিগ্রী লাভ করিয়া এম, এ শুরু করিয়া দিলাম। ভগবান বুঝিলেন বিষয়ের দিকে মন বেশী আকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাই কিছু কষ্টও অশান্তিরূপ আশীর্ব্বাদ পাঠাইলেন কৌশলে। যন্ত্রণা না পাইলে ধর্ম্মবুদ্ধি জাগে না।

শহরে প্রায়ই ঔষধ আনিতে যাই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র রায়ের কাছে। ভদ্রলোক কলিকাতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার।

পরম গুরুভক্ত শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজীর শিষ্য। আমার সঙ্গে বৃদ্ধের একটু ভাব হইল। ঔষধ আনিতে গেলে ২/৩ ঘন্টা বসাইয়া কেবল গীতা, ভাগবত ও শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তিনি আমাকে হোমিওপাথি শিক্ষারজন্য একখানা বই ও একটা বাক্স দিলেন। ব্রাহ্মণ হিসাবে সম্মান দিলেও ছেলের মত স্নেহ করতেন। প্রায়ই বলিতেন, "প্রভু রোজ গীতা পাঠ করবেন এবং আমার কাছে আসবেন আলোচনা করবেন। আপনার রাস্তা খুলে যাবে যেহেতু মহান সদ্‌গুরুর আশ্রয় পেয়েছেন। সংসারে থাক্‌লে দুঃখকষ্ট আসবে এবং সহ্য করে যেতে হবে। বাসুদেবের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে"। তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী প্রসাদ দিতেন যখনই যাইতাম। আর গেলেই এক প্রশ্ন, গীতার কতটুকু পড়া হইয়াছে।

মনে মনে ভাবি আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া গীতা পাঠ তো দূরের কথা আজ পর্য্যন্ত খুলিয়াও দেখিনাই ভিতরে কি আছে। আরেকদিন গেলে কি জবাব দেবো। অথচ বীরেন রায় ব্রাহ্মণ না হইয়াও গীতার শ্লোক অনর্গল বলিয়া যান। গুরুর বাক্যও পালন করি নাই। বাহির করিলাম গীতা। বড় কষ্ট উচ্চারণই হয়না। বাংলা অনুবাদ পড়িলাম। সব অধ্যায়েই দেখি ভক্তির প্রাধান্য। একদিন আবার গেলাম ঔষধ আনিতে সেইদিনও প্রশ্ন, "গীতা পড়ছেন তো"? হাঁা, পড়ছি অর্থাৎ শুরু করেছি। তবে বুঝিনা কিছু। অনুবাদ পড়েছি ১৮ অধ্যায়ের। বলুন তবে, কোন অধ্যায় সবচেয়ে ভাল লেগেছে" বলিলাম,— "দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ।" বৃদ্ধ উঠিয়া আমাকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। এরপর হইতে যখন ভক্তিমূলক গান, ভজন ইত্যাদি বৃদ্ধকে গান গাইয়া শুনাইতাম তাঁহার আনন্দাশ্রু ঝরিত। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। ইহাও আমার প্রেমিক গুরুর অহেতুক কৃপা।

আমার আত্মীয় কবিরাজ ও পণ্ডিত গোপেশচন্দ্র ন্যায় তর্কতীর্থের কাছে যাইয়া নিবেদন করিলাম আমাকে গীতাপাঠ শিখাইবার জন্য। তিনি চা, সন্দেশ খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন এক গল্প শুনাইয়া। গীতা শিক্ষালাভ আর হইল না। উপায়ান্তর শ্রীগুরুর শরণ নিলাম। গুরু ও কৃষ্ণ অভিন্ন। গীতা ও গুরুশিষ্য সংবাদ। সুতরাং গুরুর দয়া হইলে গীতাজ্ঞান আমার মধ্যে

প্রকাশিত হইবেই একদিন। পণ্ডিত মহাশয়ের গল্পটি হয়তো অনেকেই জানেন। পুরীতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্ব-পার্ষদ সমুদ্র স্নানে যাওয়ার সময় একদিন দেখেন এক ব্রাহ্মণ গীতাগ্রন্থ উল্টা ধরিয়া কি যেন বলিতেছে। চোখদিয়া প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতেরা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতেছেন অথচ মহাপ্রভু সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি গীতায় কি দেখেন, কেনই-বা কাঁদেন। ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন যে প্রত্যেক শ্লোকের সাদা অংশে দুই লাইনের মাঝখানে দেখেন কুরুক্ষেত্রে রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্ত অর্জ্জুন নতজানু হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদেন। তিনি গীতাপাঠ করিতে পারেন না। শুনিয়া মহাপ্রভু শিষ্যভক্তদের শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকে বুকে নিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণের জীবন ধন্য হইয়া গেল স্বয়ং ভগবানকে অন্তর্বাহ্যে পাইয়া। পণ্ডিত শিষ্যভক্তরা লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আমার গুরুদেব ও আমাকে অনেকবার গীতাপাঠ করিয়া শুনাইতে বলেন। ভুলশুদ্ধ জানি না, তবে গীতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। গুরুদেব শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। একদিন গীতাপাঠ করিতেছি ঠাকুরের সামনে বসিয়া। খুব মনোযোগ দিয়া ঠাকুর শুনিতেছেন। হঠাৎ বলেন "কি যেন পড়ছিলি ? অনিকেত স্থিরমতি ভক্তিমান মে প্রিয় নরঃ। 'অনিকেত' শব্দের অর্থ কি জানিস্ ? 'অনিকেত' মানে এই পৃথিবীতে আমাদের স্থায়ী কোন ঠিকানা নাই। আমাদের স্থায়ী ঠিকানা এখানে নয়, ওখানে। তুই যে একটা গান করিস্ সেইখানে"। আচ্ছা গা তো সেই গানখানা—

এই মনের অভিলাষ
বিলাসকুঞ্জে দিও বাস
নয়নে হেরিব সদা
যুগল রূপ রাশি ॥
নমো নমোরে তুলসী
কৃষ্ণ প্রেয়সী— ইত্যাদি।

Hare Krisna, hare Krisna, Krisna Krisna, hare hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama, Rama, Hare Hare

এক রবিবারে সকালবেলা বাহিরে বসিয়া জুতা পালিশ করিতেছি হঠাৎ আমার সরকারী বাসার উত্তরদিকের রাস্তা দিয়া দয়াল ঠাকুরকে আসিতে দেখিয়া দাদুভাই গুরুদেব আসিয়াছেন বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠি। পরিষ্কার দেখিলাম সেই হাসিমুখ। বাঁ দিকের কাঁদে ভাঁজ করা সাদা চাদর। হাতে লাঠিভর দিয়া আমার বাসার দিকে আসিতেছেন। আমি তো দিলাম দৌড়। আমার স্ত্রীও বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কোথায় গুরুদেব? তবে কি পূর্ব্বদিকের রাস্তা দিয়া গিয়াছেন। গুরুদেব এই সময়ে আসিতে পারেন যেহেতু তিমি জানেন আমি ইম্ফলে বদলী হইয়াছি। কিছুক্ষণ আগে কলিকাতার ফ্লাইট আসিয়াছে আকাশে দেখিয়াছি। বিশ্বনাথদা হয়তো নিয়া আসিয়াছেন। খুঁজিয়া কোথাও পাওয়া গেলনা। গেইট আছে তিনটা। পাহারাদারদের জিজ্ঞাসা কারলাম, "এইরূপ চেহারার কোন সাধুকে আসিতে দেখিয়াছ কি?" সকলেই জবাব দিব,— "নাতো কেউ আসে নাই।" প্রতিবেশীদের কেউ হাসিল, কেউ সান্ত্বনা দিয়া বলিল,— "আপনার মনের ভ্রম। হয়তো ভাবছিলেন তাই মনে হয়েছে গুরু আসছেন। একি সম্ভব মশাই? আপনি আছেন ইম্ফলে আর আপনার গুরু থাকেন হাওড়া মনশুকায়।" আমার তো এই ঘটনায় মাথা নষ্ট হওয়ার উপক্রম। পরিষ্কার চোখে যাঁহাকে দেখলাম কি করিয়া অন্যদের বুঝাই। পোষাক বদলাইয়া ছুটিলাম বাবুপাড়া শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামীর বাড়ীতে। গোঁসাইজী শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রিত পরম বৈষ্ণবভক্ত এবং বাবুপাড়া হাইস্কুলের উপ-প্রধান শিক্ষক। তিনি তো ঘটনা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা। বলিলেন, "আপনার গুরুদর্শন হইয়াছে। আপনি তো পরম ভাগ্যবান। আর চিন্তা নাই। গোস্বামী প্রভুর কথায় কিছু বিশ্বাস হইলেও সন্দেহ রহিল। গেলাম শ্রীযুক্ত খোকন মুখার্জ্জীর কাছে। খুকু মুখার্জ্জী সারস্বত মঠে ১৪ বৎসর ব্রহ্মচারী ছিলেন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের আশ্রিত ও স্বামী সত্যানন্দের শিষ্য, পরম গুরুভক্ত যাঁহার মুখে সর্ব্বক্ষণ জয়গুরু মহানাম উচ্চারিত হয়। মুখার্জ্জীদা বলিলে বিশ্বাস হইবে। ঘটনা শুনিয়া মুখার্জ্জীদা জোরে কান্না শুরু করিয়া দিলেন এবং আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। ভাই আপনার জীবন ধন্য হইয়াছে। যথার্থ সদ্‌গুরু

লাভ হইয়াছে ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।" ছাড়া পাইয়া বাসায় ফিরিলাম। আমার ভাই কুশীরঞ্জনও তখন ইস্ফলে। তাহাকেও জানাইলাম— কে কি বলিয়াছেন।

কলিকাতায় বিশ্বনাথদাকে চিঠি দিলাম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যাসত্য যেন অতি সত্বর আমাকে জানান। জবাব আসিল "তোমার ভাগ্য ভাল ঠাকুরের দর্শণ পেয়েছো। তবে বাবা বলছেন, সবকিছু ঢোল পিটিয়ে বলতে হয় না।" কয়েক বৎসর পর গুরুদর্শনে গেলে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,— এর মধ্যে এমন বড় কি দেখলে। কত দেশ বিদেশ, কৈলাস, মহাকাশ ঘুরেছি। অনেকদিন পূর্ব্বের কথা— আমিও স্বামী নিগমানন্দ মণিপুরে গেলাম আকাশ পথে। এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে নামতে পারলাম না। কলকাতা ফিরে এসে প্রস্রাব করেছি।" তখন পর্য্যন্ত মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থ বা যোগের গ্রন্থাদি পড়ি নাই। ঠাকুর বই পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন— মাথা গরম হইবে বলিয়া। রামকৃষ্ণ কথামৃত এবং রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনী পড়িয়াছিলাম। যোগীশ্বরদের এত ক্ষমতা হয় বুঝিতাম না। পরে ১৯৭৯ ইংরাজীতে যোগের বই পড়ার অনুমতি দেন এবং বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ খরিদ করিবার নির্দ্দেশ দেন। গাছে কিভাবে উঠিলাম জানিনা ' ফল খাওয়ার পরই বুঝিলাম কোথায় আছি। গ্রন্থাদি পড়িয়া সব মিলাইয়া লইলাম এবং গুরুমহিমা, গুরুকৃপা অনুভব করিয়া চোখের জলে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

গুরুকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া যাইতেছি এবং তিনিও অম্লান বদনে আমার ধৃষ্টতা সহ্য করিয়া যাইতেছেন। একবার ভাল শাস্তি দিলেন পরম আশীর্ব্বাদ স্বরূপে এবং আমি ও কান ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম যে আর পরীক্ষা করিব না। একটা যোগের বই অন্যের কাছে পড়িয়া নিজের খেয়াল খুশীতে রাতারাতি সিদ্ধিলাভ মানসে প্রাণায়াম ক্রিয়া শুরু করিলাম। অন্তর্য্যামী গুরু মনে মনে হাসিলেন এবং তামাশা দেখিতে লাগিলেন। দুই নাক দিয়া অনবরত রক্তপাত হইতে লাগিল। ঔষধ. ইনজেক্শন সব ব্যর্থ। সন্তদাস বাবাজীর গোষ্ঠি ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার (কাপ্তান) এস, এন, রায়চৌধুরী শুধু ফৌজী ডাক্তারই নন, হোমিওপ্যাথেও

ভাল অধিকার ছিল। তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু খবর জানিতেন। একদিন ডাকিয়া বলেন, "এখন কিছুদিন আমি যা বলা পর্যন্ত আর প্রাণায়াম করিবেন না। ঔষধ দিলেন। রক্তপাত বন্ধ হইল"। এখন উপায় ? ঠাকুরের কাছে চোখের জলে প্রার্থনা জানাই, "হে দয়াল হাজার মাইল দূরে থাকি তোমার কাছে থাকিয়া সাধন ভজন করার সৌভাগ্য আমার কখনও হইবেনা। তবে কি জীবনটা এইভাবে মাটি হইয়া যাইবে ? "কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো তো। গুরুর বোধহয় হৃদয় দ্রবীভূত হইল। আমার ছেলের বয়স বোধ-হয় একবৎসর হয় নাই। তবে সে আমার বুকেই শুইত আমার পৃথক বিছানায়। লক্ষ্য করিয়াছি কোন কারণে বোধহয় সে ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিত। তাই জপধ্যান করিতাম নীচে কম্বলে বসিয়া।

একদিন শেষরাত্রে পরম প্রেমময় দয়ালগুরু স্বপ্নে দেখা দিলেন। আমার শিয়রে বসিয়া বলেন,— উঠ্— আমাকে অনুকরণ কর। পরিষ্কার কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ, এইভাবেই করে যা। আমি আসছি বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। আমিও জাগিয়া অনুভব করিলাম এবং অবাক হইয়া গেলাম। এ স্বপ্ন না বাস্তব ? সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া কম্বলে বসিয়া গেলাম এবং যথারীতি প্রাণায়াম ক্রিয়া সহজ সরলভাবে হইতে লাগিল। এই আনন্দ কাহাকেও প্রকাশ করার মত নয় অথচ নিজেকে সামলাইতে পারিতেছি না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। সেই রাত্রি হইতে আর কোন সমস্যা নাই। শিবগুরুর জয় দিলাম। তাইতো লিখিলাম— "অহেতুক কৃপাসিন্ধু, আর্তদীনবন্ধু, প্রেমকল্পতরু শ্রীগুরু নাথ। পরমপুরুষ জয় জগন্নাথ"। এতদয়া তোমার ঠাকুর এই নরাধমের উপর। কৃতজ্ঞ-তার সুরে কণ্ঠে আসিল—

নিঠুর হলে নামটি তোমার
দয়াল হতনা,
অজ্ঞান বলে তোমার লীলা
বুঝতে পারিনা॥

তোমার প্রেমে পাগল যারা
বিষয় বুদ্ধি জ্ঞান হারা
দিবানিশি তাদের তরে
তোমার যত ভাবনা ॥
শুনে তোমার গুণগাঁথা
অন্তরে বাজিছে ব্যথা,
দয়াল নামে বাজুক আমার
জীবন বীণায় বন্দনা" ॥

শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পন করিতে আর কোন বাঁধা বা সংশয় রহিল না। মহাযোগেশ্বর, মহাতপস্বী, পরম বৈষ্ণব, পতিত পাবন, প্রেমিকগুরুর জয় হউক।

রাণীবাড়ী আশ্রমের লীলা কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। আমার দীক্ষা পর্ব্ব, বলদের মুক্তি, আমার মা ও ঠাকুরের শ্বাশুড়ী উদ্ধার হইলেও বড় দায়িত্ব একটা রহিয়া গেল। সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী মানদাসুন্দরী এতকাল যাবৎ পরিবারের দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। এইবার স্বামীর উপস্থিতিতে পরম খুশী হইয়া একটু সেবা করার সুযোগ পাইলেন। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভোলানাথ সতীর ইচ্ছাপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিত্যলীলায় পাঠাইয়া দিলেন। বড় মজার এই লীলা। একরাত্রে একটু শ্বাসেরটান উঠিল, বাড়িয়া গেল। গুরুমা বড় ছেলেকে ভজন কুটীরে পিতার কাছে পাঠাইলেন। অন্তর্য্যামী বুঝিলেন এখন সময় হইয়াছে। আসিয়া কাছে বসিলেন। সতী স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া হাসিমুখে বিদায় চাহিলেন। ছেলে, বৌ সকলে মুখে গঙ্গাজল দিলেন। পরিবার পরিজনদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দৈবরথে আরোহণ করিলেন। ঠাকুর পত্নীর অন্তিম সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন করাইয়া এইবারের মত রাণীবাড়ী আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আবার পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর এক জায়গায় বেশী দিন থাকিতেন না। তাহার কারণ

মানুষ সাধু দর্শন করিতে আসিয়া বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজিয়া খুব জ্বালাতন করিত। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে শান্তিতে থাকিতে পারিতেন না। একবার মৌন অবস্থায় সারা ভারতবর্ষ পায়ে হাঁটিয়া পরিক্রমা কালে এক জায়গায় পৌঁছিলেন। সঙ্গে ছিল তুইটি বস্তা, কমণ্ডলু ও ত্রিশূল। বস্তার ভিতরে ঢুকিয়া বহু রাত্রি গাছতলায় কাটাইয়া দিতেন। সাধুর প্রাভাবে মানুষের ভিড় জমিয়া যাইত। এক ভদ্রলোক আকৃষ্ট হইয়া রোজ একটা সাদামগে একমগ তুধ আনিয়া সাধুকে পান পান করাইতেন পরম শ্রদ্ধার সহিত। সেই ভদ্রলোক আর কেহ নয়, মহাত্মাগান্ধী এবং তাঁহার কাছেই জানিতে পারিলেন এই জায়গার নাম বোম্বাই। কয়েকদিন বোম্বাইএ থাকিয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

বোম্বাই থাকা কালীন সর্ব্বাঙ্গে গু মাখা একজন উচ্চ কোটীর মৌন সিদ্ধ মহাত্মা গুরুদেবের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন। লোকে আসিয়া জ্বালাতন করিবে না বলিয়া এইভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। এইরূপ বহু পাগল আছেন যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু আত্মরক্ষাও লোকসঙ্গ পরিহার করিবার জন্যই তাঁহাদের পাগলের অভিনয়।

ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন 'লোক নয় পোক্ দেখ্না সবসময় শিবপূজার জন্য নিখুঁত বেলপাতা পাওয়া যায়না, যেহেতু পোকায় নষ্ট করিয়া দেয়। সেইরূপ স্বার্থপর মানুষও সাধু সন্তকে শান্তিতে বাঁচিতে দেয় না। কথা প্রসঙ্গে তিনশত বৎসর বয়স্ক মহাসিদ্ধ তিব্বতীবাবার দেহত্যাগের কাহিনী শুনাইলেন। এক তুরারোগ্য কর্কট রোগী তাঁহার শরণে আরোগ্য লাভের জন্য আসিয়া প্রার্থনা জানাইলে বাবার দয়া হইল এবং আশ্বাস দিয়া একটি মেষ নিয়া আসিতে বলিলেন। মেষের কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিলেন যে যোগবলে এই কঠিনরোগ মেষের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিলে রোগী বাঁচিয়া যাইবে। মেষ আনা হইল, তবে উপস্থিত কিছু পশু প্রকৃতির পাষণ্ড তিব্বতীবাবাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিল যে তিনি যদি এতই দরদীও প্রেমিক হন তবে একটি নীরিহ মেষ শাবককে না মারিয়া এই রোগ নিজের শরীরে

ধারণ করেন না কেন? বাবার সেবকরা কর্ম্মপোলক্ষ্যে বাহিরে গিয়াছিল। বাবা হয়তো বিধাতার ইচ্ছা ভাবিয়াই যোগ বিভূতির সাহায্যে এই রোগ নিজের শরীরেই ধারণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। রোগী সুস্থ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সেবকরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া এই ঘটনা শুনিয়া পাষণ্ডদেরে বুঝাইয়া দিল যে একটা ইতর প্রাণীর চেয়ে এইরূপ একজন সিদ্ধ মহাত্মার জীবনের মূল্য অনেক। মেষ শাবককে লইয়া কোটী বৎসর বাস করিলও সমাজের মূর্খদের কোন লাভ হইত না। অথচ একজন সিদ্ধ মহাত্মা যাঁহারা উপস্থিত ও দর্শনে সমাজ মানুষের কত কল্যাণ সাধিত হয়। সামান্য একটা মেষ শাবকের জীবনের বিনিময়ে একজন শুভানুধ্যায়ী সিদ্ধ মহাত্মাকে চিরতরে হারাইয়া মূর্খেরা নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিল।

জগদ্‌গুরুর মহিমা প্রকাশের ক্ষমতা আমার নাই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভক্তদের নিকট যেসব সত্য ঘটনা শুনিয়াছি সেইগুলি সংক্ষেপে প্রকাশের দ্বারাই সাধক ভক্তদের একটু আনন্দদানের প্রয়াস করিতেছি।

॥ পাঁচ ॥

আগেই বলিয়াছি ঠাকুরের মহিমা প্রকাশ করিতে গেলে আমাদের কথাই বারবার আসিবে। নানা কারণে সংসার জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা আসিয়া গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে ছাড়িয়া গেলেই যে ধর্ম্মলাভ হইয়া যাইবে তেমনতো নয়। সংসারের ঝামেলা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করা কাপুরুষতা। দেখি ঠাকুর কি করেন।

একদিন অফিসে যাওয়ার পথে শ্রীহরিমন্দিরের দিকে তাকাইয়া কাতরতায় ভাঙ্গিয়া পড়িলাম। মাথায় কল্পনাতীত ভাবে একটা ছন্দ আসিল এবং সিগারেটের প্যাকেটে লিখিয়া রাখিলাম। অফিসে আসিয়া ভাল কাগজে লিখিলাম। বরাহনগর বাড়ী আমার সহকর্ম্মীও বন্ধু শ্রীঅমিত রায়চৌধুরী পড়িয়া বলে, সুন্দর একখানা ভজন হয়েছেতো। আরে তুমি যে কবি হয়ে গেলে"। বন্ধুর অনুরোধে সুর দিয়া গাইলাম। ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ হইল,— 'তুই অনেক বই

লিখবি"। জীবনে এই প্রথম লেখা ৯ জানুয়ারী ১৯৭২।

"জীবন চলে যায়, প্রভু
তাই ডাকি তোমায়.
চরণাশ্রিত তব এ দীন
দয়াকর ভগবান।
তুমি বিনে এতিন ভুবনে
কে আছে আর আপনার;
পতিত পাবন হরি দীন দয়াল প্রভু
কর মোরে এ ভবে ত্রাণ।
প্রেমের দেবতা হৃদয়ে বিরাজ
দরশণ দিও মহারাজ,
মায়াময় সংসারে আছে শুধু যাতনা
দিও মোরে শ্রীচরণে স্থান।

সেই রাত্রেই একখানা কীর্ত্তন লিখিলাম। রোজই লিখি। একদিনে সাত আটখানা কবিতা ও গান লিখাও হইয়াছে। যেন ফোয়ারার মত কবিতা ও গান ঝরিতে লাগিল। কেউ যেন ভিতরে বসিয়া বলিতেছে আর আমি খাতায় লিখিয়া যাইতেছি। সংসার ত্যাগের চিন্তা, পারিবারিক ও শারীরিক অশান্তি সব ভুলিয়া গেলাম। অফিসে বসিয়াও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছন্দ নোট করিয়া রাখিতাম। রাত জাগিয়াও লিখিয়াছি।

ইম্ফলে সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের প্রায়ই যাওয়া আসা আছে। আমি কবিতা ও গানের খাতা সঙ্গে লইয়া যাইতাম। সাধুসন্ত, মাষ্টার, প্রফেসারদের সঙ্গেও আলোচনা করিতাম। ঠাকুর খুব আনন্দ দিতে লাগিলেন। কুচবিহারে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী ইম্ফলে একটা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য আসিলেন। শ্রীযুক্ত বীরেন রায়ের অনুরোধে দয়া করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আমার বাসভবনে আসেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও স্বামীজী ভিজিয়া সময়মত উপস্থিত হন বিকাল ৪টায়। রাত ৯টা পর্য্যন্ত আমার লেখা নিয়া এবং রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রভৃতি নিয়া আলোচনা করিয়া খুব খুশী হইয়া বিদায়

নিলেন। পরের দিন আবার স্বামীজীর অনুরোধে বাবুপাড়ায় কমিশনার সেনশর্ম্মার বাড়ীতে আলোচনা কালে হরিসভায় আমাদের নিমন্ত্রণ জানান। হরিসভায় স্বামীজী ভাষণ দিলেন। আমিও অনুরোধে আমার লেখা গান শুনাইলাম। সেইদিন হইতে আমি হরিসভার নামকরা সভ্য হইয়া গেলাম। সকলে কিন্তু আমার গুরুর জয়গান করিলেন। গুরুকৃপা ক্রমশঃ অনুভব করিতে লাগিলাম।

বৃন্দাবনবাসী এক জটাজুটধারী মহাত্মাকে দর্শণ করিতে যাইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। মহাত্মা নিজেই আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, কিছু জিজ্ঞেস করবে ?" আমি নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, আমার প্রকৃত গুরুভক্তি লাভ হইবে ?" মহাত্মা প্রশ্ন শুনিয়া তো অবাক। মানুষ সাধুসন্তের কাছে যায় বৈষয়িক সমস্যা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপার নিয়া। দিনরাত হাজার লোকের ভিড়। প্রণাম, নানাবিধ প্রশ্ন, প্রণামী, দক্ষিণা দান চলিতেছে। মহাত্মা সহাস্যে বলিলেন, "অবশ্য, অবশ্যই হবে।" হাত উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। গুরুভক্তি যে সর্ব্বসাধন সিদ্ধির মূল এই জ্ঞান গুরু ক্রমশঃ বুঝাইয়া দিলেন।

মা কালী উৎপাত শুরু করিয়া দিলেন। আমার পূর্ব্বপুরুষের ইষ্টদেবী এবং বাল্যকাল হইতে কালীকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম। কুলদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণকে খুবই ভালবাসিতাম। ৮ বৎসর বয়সে উপনয়ন হইয়াছিল। তখন হইতেই লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা, নিদ্রা মাঝে মাঝে বিষ্ণুকে তুলসীপত্র দেওয়া, মৃত্তিকা শিব গড়িয়া পূজা করা যেন আমার স্কুলের লেখাপড়ার অঙ্গ হিসাবে দাঁড়াইয়া গেল। অন্য কেহ পূজা করিলেও মনে হইত যেন ত্রুটী রহিয়াছে যেহেতু আজ আমার হাতে দেওয়া হয় নাই। মা ও বাবা হাসিতেন। খরচ তো নাই তেমন। একটা অতিরিক্ত নৈবেদ্য লাগে মাত্র। সুতরাং আমার যখন খুশী শিব বানাইয়া পূজা করিতাম। কোন বন্ধুর অসুখ হইলে কিংবা বিবাদ হইলেও তাহার মঙ্গলার্থে এইসব অনেকবার করিয়াছি। এমনকি কবচ তৈয়ার করিয়া দিয়াছি এবং আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছে বন্ধু শ্রীমনোরঞ্জন দে যাহা সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না। হেড্‌মাষ্টার পদে থাকিয়া এইবার অবসর গ্রহণ করিয়াছে। আজও আমার

অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে স্বামী স্বরূপানন্দের শিষ্য। তাহার স্ত্রী দীপালী খুবই ভক্তিমতী।

গুরুদেব আমাকে কৃষ্ণমন্ত্র দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পিতৃবংশ তো শক্তি উপাসক। তবে কৃষ্ণমন্ত্র দিলেন যে? জবাব স্পষ্ট, "সদ্গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার রুচিমত মন্ত্র প্রদান করেন না। যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহাকে তাহাই দেওয়া হয়।" কি বিপদে পড়িলাম রাধাকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে মা কালী সামনে দাঁড়ান। এই দ্বন্দ্ব গুরু দূর করিয়া দিলেন। লিখিলাম একখানা গান।

কেন মন কর ভেদ
বিচার করিয়া দেখ,
পরব্রহ্ম অভেদ
কালীকৃষ্ণ এক।
যে মা কালী ভৈরবী
সে যে পরমা বৈষ্ণবী
শক্তি বৈষ্ণবের ইষ্ট
পরমেশ্বর এক ॥
যখন হবে জ্ঞানের বিকাশ
দেখতে পাবে স্ব-প্রকাশ,
তখন ভুলে যাবে ভেদাভেদ
বলেরে বিবেক ॥

গুরুদেব বলেন, "যতক্ষণ সংসারে আসক্তি আছে, ততক্ষণ কৃষ্ণনাম জপ করিলেও শাক্ত। আসক্তি সম্পূর্ণ দূর হইলে কালীমন্ত্র জাপকও বৈষ্ণব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামপ্রসাদ-এর মত বৈষ্ণব কয়জন আছে জগতে? কেবল তুলসীর মালা, তিলক ধারণ, হাতে জপের মালা এবং মুখে কৃষ্ণনাম করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায়না। উর্দ্ধরেতা, প্রেমসিদ্ধ পুরুষই প্রকৃত বৈষ্ণব। সাধক মাত্রেই শাক্ত। এখন বুঝলি কিছু?" কি আর বুঝিব। ভিতরে জ্বালা, আমি কবে বৈষ্ণব হইব। আমার তো ভক্তিও নাই। অদ্যাবধি গুরুকে পরীক্ষা করিয়াই চলিয়াছি। গান গাই, ধন্য কর দাসে প্রভু;

প্রেমভক্তি ধনে। অনেক দূর আমার গন্তব্য।

গুরুর দয়াতে মণিপুরে বদলী হওয়াতে কিছুটা মনুষ্যত্ব লাভ হইয়াছে। সৎসঙ্গ লাভ হইয়াছে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। "সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়; লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।" নরোত্তম ঠাকুরের 'হরিসাধক কণ্ঠহার' পড়িয়া খুব আনন্দ হইল। বইখানা ঠাকুর আমাকে দিয়াছিলেন। "পড়িয়া দেখ্ ইহাই আমাদের পথ। ওরে তুই তো গৌরাঙ্গের গণ।" পাল্টা প্রশ্ন করিলাম জবাব দিলেন না।

ইম্ফলে এক জটাজুটধারী স্বয়ম্ভু পরমহংসের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল। ধর্ম্মলাভের আশায় সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম। যথাসাধ্য সেবা করিতাম। পরমহংস প্রত্যেক মাসে দুই রবিবার আমার ঘরে আসিতেন এবং আমার যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিতাম। গীতাপাঠ, কীর্তন, ধর্ম্মালোচনা হইত তিনি আমার শিক্ষাগুরু হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রাণায়ামাদি শিক্ষা দিতে চাহিলেন। এক রবিবারে খালি-গায়ে ঠাকুরের সামনে বসিয়া আমি ক্রিয়া শুরু করিলাম এবং তিনি ঠিক আমার পিছনে কম্বলে বসিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠেন "আপনার সব ঠিক আছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।" সেইদিন হইতে বাবাজী আর আসেন নাই। এমনকি রাস্তায় বা বাজারে গেলে দূর হইতে দেখিয়া তিনি গা ঢাকা দিতেন। আমার তো সব গুরুই করিয়া যাইতেছেন। পরবর্তীকালে ঠাকুর যখন হঠযোগ প্রদীপিকা পড়িতে দিলেন, তখন সব মিলাইয়া নিলাম এবং আনন্দে গুরুর জয়গান করিলাম।

আমাদের সমাজে কিছু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের কুকর্ম্মে, কপট আচরণে এবং ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়ী অপপ্রচারে সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইহারা ধর্ম্মরক্ষার কোন সহায়তা করিতেছেনা বরং অন্যের বিশ্বাস নষ্ট করিয়া, একজন দীক্ষিতকে প্রলোভনের জালে জড়াইয়া গুরু দ্রোহীতার পাপে লিপ্ত করিয়া আপন আপন স্বার্থ আদায়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই পাপ যে তাহার এবং তাহার বংশধরদের সর্ব্বনাশ করিবে এইজ্ঞান নাই। সবাইতো আর ব্যাকুব নয়। নিজের মাকে তাড়াইয়া দিয়া

প্রতিবেশিনীকে মা'য়ের আসনে বসাইবার মত দুর্ব্বলও হীন মনোবৃত্তি সকলের নাই। আমি জীবনে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি এই ধার্ম্মিক-দের মুখোশপরা শয়তানদের হাতে ইস্ফলে থাকিতে। দয়ালগুরু একটু বিভূতি প্রকাশ করার ফলে ইহারা আমার পিছা ছাড়িয়া দিল কিছুটা ভয় পাইয়া। ভগবান দুই একজনের ভাল শাস্তিত দিয়াছেন।

ঠাকুরকে ঘটনা বিবৃত করিলে বলিলেন, "ঝগড়া করবে না। এদের ভুল ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে পার। যাহারা প্রতিষ্ঠাও পয়সার কাঙ্গাল এদের পরমার্থ লাভ হয়না। ধর্ম্ম তাদের মুখের বুলি। ভগবান অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। ধর্মদ্রোহীদের পরিণাম খুব খারাপ। যাহারা গুরুভক্ত, তহারা বিভূতি চায়না। বিভূতির দরকার কি? সেটা গুরুইতো তাহাদের কাছে ভক্তি বন্দী। গুরুর শক্তি চায় না, গুরুকেই চায় প্রকৃত গুরুভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, বানরের বাচ্চা না হইয়া বিড়ালের বাচ্চা হওয়া ভাল। তাহা হইলে মা বাচ্চাকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করে। শক্তির চেয়ে ভক্তির স্থান উপরে। ভক্তি-যোগে কিনা হয়। ভক্তিছাড়া কোন মার্গেই সিদ্ধি হয় না। তোমরা ভক্তিযুক্ত হইয়া চল। গুরুতে নির্ভরতাই আসল কথা।

মানুষগুরুতে নির্ভরতা সহজে হইবার নয়। বিশ্বাস করা বড় কঠিন। সেইরকম ভক্ত জগতে বিরল। ভাগ্যগুণে যদি কাহারও তেমন হয় তো জীবন সার্থক। গুরুগীতায় জগদ্গুরু শিব-পার্বতীর উত্তরে বলেন- "যস্য দেবে পরাভক্তি যথাদেবে তথা গুরৌ"। মহাজনরা তাই গাহিয়াছেন— গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি, কদাপি না মনে আন্। নররূপে জগদ্গুরু, মূর্ত ভগবান।

গীতায় আছে— "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া, উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনো তত্ত্বদর্শিনঃ"। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিৎ গুরুর কাছেই জানিয়া লইতে হয়। বই পড়িয়া এইজ্ঞান লাভ হয় না। যোগাদি ক্রিয়া, প্রেমভক্তি সাধন, সবই যোগী, প্রেমিক গুরুর কাছে শিক্ষা করিতে হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন— "তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুনঃ."

॥ ছয় ॥

আমাদের গুরুদেবের লীলা বুঝা কঠিন। ১৯৭৬ সালে আবার রাণীবাড়ী আশ্রমে হঠাৎ আসিলেন দীর্ঘ আট বৎসর পর। এইবার আসিয়া উঠিলেন তাঁহার মেঝভাইএর বাড়ীতে। পরে আসেন আশ্রমে। সকলেরই মনে প্রশ্ন জাগিল এইবার কোন্ লীলা করিবেন। এইবার কাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। বৃদ্ধা দুই দিদি। বড়দিদির বয়স ৮৭ বৎসর। মনে মনে আকাঙ্খা রমেশের হাতে যাইতে পারিলেই হয়। অন্তর্যামী রমেশ তাই আসিলেন। আমার ভগ্নীপতি রমেন্দ্র গোস্বামী, কীর্তন সুধাকর ঠাকুরের অতিপ্রিয় নাতজামাই এবং যাঁহার মধুর রাধা-
গোবিন্দ লীলাকীর্তনে সমাধি হয়. রাসপূর্ণিমার রাত্রে আশ্রমে "নৌকা-
বিলাস" পালা কীর্তনের দ্বারা গ্রামবাসী ভক্তদের ও প্রেমের ঠাকুরকে
আনন্দ দিতেছেন। রাধারাণী ও ব্রজগোপীরা যমুনার ওপারে যাওয়ার
জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকায় উঠিয়া পারের কড়ি লইয়া দরকষাকষি করিতেছেন।
আকাশে কালো মেঘ দেখিয়া সকলের নৌকাডুবির ভয় জাগিল। এই-
দিকে কালো কৃষ্ণ গোপীদের সমস্ত সরনবনী খাইয়া ও যেন খুশী নন।
তবে আর কি চায়? সেই বিচার ভক্তেরাই করুক।

আজ তিথিহিসাবে রাসপূর্ণিমা। কৃষ্ণচন্দ্র আজ গোপীদের মনো-
বাসনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকলেই রাসে মিলিত
হইয়াছেন। বোধহয় একগোপীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন সকলে।
আমার দিদিমা-ঠাকুরের বড়দিদি রাধাগোবিন্দ বলিতে অজ্ঞান। যথা-
রীতি জপসন্ধ্যা করিয়া গীতা বুকে লইয়া বিছানায় শুইয়া বোধহয়
নাতজামাইএর "নৌকাবিলাস" পালা কীর্তন শুনিতেছেন অথবা শ্রীকৃষ্ণের
মহারাসে একগোপীর অভাব অনুভব করিয়া যাওয়ার জন্য সাজিতেছেন
"অন্তশ্চিত্রিত গোপীবেশে"। হঠাৎ কোলাহল শুরু হইয়া গেল, রমেশ
আসনে সমাধিস্থ। (Goloke gopise gaman)

দিদিমা আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। গীতা, চণ্ডী, কালিকা, পুরাণ, মহাভারত, ভাগবত, রামায়ণ প্রভৃতি কত ভালভাবে জানিতেন ও গল্প বলিতেন, আমরাতো অবাক হইয়া যাইতাম। আমাকে ছুটিতে গেলে

বলিতেন; "রোজ গীতাপাঠ করিস্" । দিদিমার স্নেহের পরিচয় কিভাবে দিলেন একটু বলা দরকার। অরুণাচল প্রদেশের কিমিনে আছি। সেই রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় যখন দিদিমা দেহ রক্ষা করিলেন সেই সময়ে আমি বাহির হইতে বাসার দিকে আসিবার সময় হরিমন্দিরের সামনে মাত্র পৌঁছিয়াছি, জ্যোৎস্নাতো আছেই। রাস্তায় লাইট আছে। হঠাৎ দেখি আমার সামনে এক মহিলা, আমার দিদিমা। মুহূর্তে অদৃশ্য। বাসায় যাইয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম, দিদিমা বোধহয় আজ মহারাসে মিলিয়া গেলেন। এইমাত্র রাস্তায় দর্শন দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ৫ / ৬ দিন পর মামার চিঠি আসিল। সকলেই অবাক।

কিমিনে থাকিতে শ্রীঅজিতকুমার রায়ের স্ত্রী এবং ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টের শ্রীঅরবিন্দ দাস স্বপ্নে দেখিলেন এক বৃহৎ কালীমূর্ত্তির পূজা হইতেছে এবং উভয়েই দেখিলেন পূজকের আসনে আমাকে। সামনেই দীপান্বিতা। অজিত রায় ও অরবিন্দ দাস একদিন আমাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন এবং কালীপূজা করার ব্যাপারে অনুরোধ জানাইলেন। আপত্তি করিলাম কারণ কখনও কালীপূজা করি নাই। পূজাবিধি তাহারা ব্যবস্থা করিয়া দিলেও বলিলাম আমার গুরুদেবের অনুমতি হইলে অবশ্যই করিব, নতুবা সম্ভব নয়।

ডিউটিতে শিলং গেলাম ঠিক দুর্গাপূজার পরেই। কয়েকদিনের ছুটিও নিলাম যাহাতে গুরুদর্শন ও কালীপূজার সমস্যা সমাধান করিয়া আসিতে পারি। কালীপূজার কথা শুনিয়া বলিলেন, "কেনরে তোকে তো শক্তিমন্ত্র ও দিয়াছিলাম। শক্তিপূজার তুই পূর্ণ অধিকারী। ভয় পাওয়ার কি আছে? কালীকে জানিস্? আমাদের সর্ব্বশরীরে মহাশক্তি কালী কিভাবে আছেন; কি তাঁহার ক্রিয়াশক্তি, সাধন সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কিভাবে শক্তিকে জাগাইতে হয়, মায়ের কৃপাতেই পিতার দর্শন ইত্যাদি নানাবিষয় নানাভাবে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখি পূজাবিধিটা একবার।' এক দুইপাতা উল্টাইয়া বইখানা ফেরৎ দিয়া বলিলেন, "একটু নিয়মক্রম কৃপেশের কাছে শিখিয়া নে। পারবি পূজা করতে।" আমি বলিলাম গুরুর আশীর্ব্বাদ

যখন পাইয়াছি অবশ্যই পারিব। তবে পূজা কিন্তু আমার মধ্যে থাকিয়া গুরুই করিবেন। জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল।

গুরুদর্শনে তো গেলাম এবং পৌঁছিলাম বেশ রাত্রে। যাইয়া শুনিলাম রাতে ঠাকুর আসনে চলিয়া গিয়াছেন আর কাহাকেও দর্শন দিবেন না। আমার শুনিয়াতো পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। ভক্তরা নিষেধ করিলেন। কি করি তবে? ঠাকুরের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিবার ইচ্ছা আমারও নাই। তবে দুঃখ এই যে দূরদেশ হইতে আসিয়াছি। থাকিব মাত্র দুইদিন। রাত্রে দর্শন না পাইলে একদিন মাটি হইয়া গেল। সামনে আসিয়া দর্শন না পাইয়া রাত্রি কাটিবে কিভাবে? হঠাৎ মনে পড়িল রামদাস কাঠিয়াবাবার গ্রন্থে পড়িয়াছি, যদি কোন মহাপুরুষ দর্শনে যাইয়া বাধা আসে তবে বাহিরে বসিয়া মহাপুরুষকে চিন্তা করিয়া ইষ্টনাম জপ করিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন এবং আত্মায় আত্মায় কথা হইয়া যায়। আমিও তাই করিলাম। বাহিরে ধূলাবালির মধ্যেই আসন করিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলাম। ধ্যানযোগে প্রেমের ঠাকুর সহ্য করিতে পারিলেন না আমার মনোকষ্ট। হঠাৎ শুনি আওয়াজ, বাইরে কেরে, আমার কেতকী বুঝি? আয় আয় ভিতরে আয়, তোর জন্যই অপেক্ষা করছি। আমি তো আনন্দে আত্মহারা চোখের জল মুছিয়া ভিতরে গেলাম। অন্য ভক্তরা অবাক। কেউ হয়তো ভাবিলেন, এত বাড়াবাড়ি কেন? অন্যের বেলা তো কড়া হুকুম।

ভিতরে যাইয়া প্রণাম করিলাম দূর হইতে বলেন, দরজাটা বন্ধ করিয়া দে। আমার পিঁড়িটা দে বসি। তুই একটা কিছুতে বস্। খাটের নীচে একটা বস্তা ছিল, তাহা লইয়া আমি বসিলাম। "কিরে তোর পেটে কিছু যন্ত্রণা আছে দেখিলাম। ভাল হয়ে যাবে যোগক্রিয়াতে। তোকে আর মন্ত্রজপ করতে হবেনা ইষ্টমন্ত্র শুধু আহুতি দিবি"।

"আমাকে অনুকরণ কর" যোগক্রিয়া দিলেন। হঠযোগ, রাজযোগের ব্যাপারতো কিছুই জানিনা। "এখন বই পড়বিনা। মাথা গরম হবে। সময়মত আমিই বলব। যা যা শিখেছিস্ করে যাবি। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের থেকে যখন মাছ ছেড়েছিস্ তখন আর খাবিনা। যখন যাহা খাদ্য পানীয় গ্রহণ করবি, অগ্নিতে আহুতি দিয়ে

প্রসাদ নিবি"।

বড় চিন্তায় পাড়িয়া গেলাম। যোগক্রিয়া করিতে পারিব। রাত্রে দুই ঘণ্টা ঘুম কমাইয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু নিরামিষ আহার এবং আহুতির ব্যাপার। ফৌজের চাকুরী করিয়া কতটুকু সম্ভব হইবে? অনাচার হইলেও পাপ হইবে। ঠাকুর বলিলেন,— "ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়। আহুতির দ্বারা শক্তিলাভ হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা জানেনা বলিয়া উপহাস করে। বলে — জঠরাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, তবে আর অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার প্রয়োজন কি? উত্তরাঞ্চলের ও নেপালের ব্রাহ্মণরা জানেন গীতায়ও আছে — "যজ্ঞশিষ্টামৃত ভুজো যান্তি ব্রহ্ম-সনাতন"। যাহারা ব্রহ্মচারী তাহাদের নিত্য হোম করিতে হয়। চাকরীতে আছিস্ যখন যেমন করে করবি। প্রভু উপায় করে দেবেন শিলংএ হোটেলে ছিলাম ৭/৮ দিন। মনে হইল গুরুদর্শনে যাইব নিরামিষ খাইয়া দেহ-মন শুদ্ধ করিয়া। অন্তরাত্মা বোধহয় আগেই ইঙ্গিত পাইয়াছিল যে এইবার গুরুদর্শনে গেলে জীবনের আরেকটা দিক তোমার খুলিয়া যাইবে যাহা আজও কল্পনাতীত।

ভাবিতেছি নূতন নিয়ম পালন করিতে যাইয়া তো গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি একবেলা মাছ না খাইয়া থাকিতে পারে না, যত দামই হউক; মাছ আনা চাই, সে এখন নিরামিষ খাইবে। সব পরিষ্কার করিয়া নিরামিষ রান্না করিতে হইবে যেহেতু গুরু, সর্ব্বদেবদেবী ও ঋষিদের আহুতি দেওয়া হইবে। মাংস ১৯৭০ সালে আমার ছোট ভাইএর বিবাহের সময় ছাড়িয়া দিলাম। এমনকি কালীপূজা হইলেও আর বলি দেওয়া হইবে না। এখন মাছ নিয়া সমস্যার সৃষ্টি হইল স্ত্রীকে মানাইয়া নিলাম। সকলেই নিরামিষ খাই, ভালই লাগে। কয়েক বৎসর পরে গুরুদেব শুনিয়া বলিলেন, বাচ্চারা মেয়েরা মাছ খাইতে আপত্তি নাই। আহুতি এক নূতন ব্যাপার। সকলেরই প্রসাদে আগ্রহ বাড়িয়া গেল। বাচ্চারা খুব খুশী। প্রতিবেশীরা ও মাঝে মাঝে প্রসাদ চাহিয়া নিতেন। বেশ মজা। নূতন এক অভিজ্ঞতা।

আশ্রম হইতে ফিরিলাম কর্ম্মফলে কিমিনে কালীপুজোর দিন সকালবেলা। ভক্তরা নিশ্চিন্ত ছিলেন মাকালী যখন স্বপ্নে দেখাইয়াছেন তখন পূজক যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন। আমার আগমন বার্তা পাইয়া সবলেই খুশী। দুইদিন রাস্তায় ভাত পেটে পড়ে নাই, যেহেতু নূতন নিয়ম শুরু হইয়াছে। আজও খাওয়া চলিবে না; যেহেতু রাত্রে কালীপূজা সন্ধ্যার দিকে গেলাম পূজাস্থলে। সব তৈয়ার হইতেছে। বিরাট মূর্তি মায়ের নীলবর্ণের। রাত্রি প্রায় ১০ টায় পূজা শুরু করিলাম। শেষ-রাত্রে হোম করিয়া জপে বসিলাম। আমার বাহ্যজ্ঞান ছিলনা। পূজা কিভাবে হইয়াছে গুরুই জানেন। ভক্তরা বলিল, কোন পাগলামি করি-নাই পূজা নাকি ভালই হইয়াছে। অরবিন্দ দাসের স্ত্রী শ্রীমতীআশা দাস চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ, মায়ের দুইচোখে দুইজলের ধারা"। সকলেই দেখিলেন। ভক্তদের মধ্যে ভাবের বন্যা বইতে লাগিল। উলুধ্বনি, শ্যামাসংগীত, কীর্তন, খুব জোরদার শুরু হইল। আমিতো জপে মগ্ন। ভোরবেলা সকলে ডাকাডাকি করিয়া আমাকে আসন হইতে উঠাইল। কিছু জলযোগ করিয়া শুইয়া থাকিলাম।

কালীপূজা ছিল শুক্রবার রাত্রে, রবিবারে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। বাঙ্গালী, অসমীয়া, নেপালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী সকলেই রবিবার পর্য্যন্ত উৎসব পালন করিল। ব্যবসায়ীরা ডাল, চাউল, মশলা, গ্রামবাসীরা শাকসব্জীর যোগান দিল এবং দিনরাত খিচুড়ী, ডালনা ভোগ রান্না করিয়া সকলে প্রসাদ পাইল।

ঠাকুর চিঠি লিখাইয়া জানিতে চাহিলেন কালীপূজা কেমন হইল। আমার বিশ্বাস স্থাপন এবং অন্যান্য শিষ্যভক্তদের অবগতির জন্যই জানিতে চাহিলেন। লোকে এখনও বলে এমন পূজা আর কখনও হয় নাই, হইবেও না।

এই কালীপূজার পিছনেও রহস্য লুক্কায়িত ছিল। অরবিন্দ দাস একসময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। হিমালয় পরিক্রমা, সাধু-সন্ন্যাসী দর্শন, কুম্ভমেলা স্নান ও সাধুদর্শন করা সত্ত্বেও দীক্ষা নিতে পারিলেন না। কিমিনে

গেলাম শিবরাত্রির পূর্ব্বে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে। অরবিন্দ দাস শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবেন। উপায়ান্তর আমাকেই শিবপূজা প্রতিষ্ঠা করিতে হইল। রাত্রে কীর্ত্তনও করিলাম এবং কিগিনে এই প্রথম হরিনাম কীর্ত্তন। তারপর প্রত্যেক শনিবারে শুরু হইল কীর্ত্তন সপ্তাহে এক এক ঘরে। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলেই আমার কীর্ত্তনে যোগদান করে। খোল-করতাল খরিদ করা হইল। অরবিন্দ দাস আমাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন যেহেতু আমি যোগসাধন করি আবার হরিনাম কীর্ত্তন, গীতাপাঠ, আলোচনা ইত্যাদি করি সংসারী মানুষ হইয়া। নিরামিষ আহুতি দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করি। তিনি প্রায়ই আমাকে স্বপ্নে দেখেন। মনের ভাব গোপন রাখিয়াই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গ করেন এবং আমাকে পরীক্ষা করেন আমার কথা ও কর্ম্মে মিল আছে কিনা দেখার জন্য তিন বৎসর পর হঠাৎ তাহার পরপারের ডাক আসিয়া গেল অসময়ে অর্থাৎ অল্প বয়সে। তাহার স্ত্রীকে হাসপাতালে মনের কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন, "তোমরা তাহার কাছে দীক্ষা নিও, যখনই সময় হইবে।" অন্তিম সময়ে তাহার স্ত্রী আমাকে জানাইলেন। আমিও তাহার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম এবং আমার গুরুগিরির শুভারম্ভ এখানেই জগদ্গুরুর নির্দ্দেশে।

১৯৭৭ সালে একদিন আমাকে বলিলেন, "আমি আর দীক্ষা দিব না। আমার শরীর বড় অসুস্থ। এখন হইতে তুই আমার কাজ করবি। দীক্ষা দিবি। কৃষ্ণমন্ত্র, ব্রহ্মমন্ত্র এইসব দিবি। তবে শক্তিমন্ত্র দিবি না। এখন কৃষ্ণনাম প্রচারের খুব দরকার। কৃষ্ণনাম ছাড়া মানুষের উপায় নাই। কঠিন সময় আসিতেছে সামনে। নামাশ্রয়ী হইয়া যাহারা চলিবে তাহারাই রক্ষা পাইবে। কেবল হরেকৃষ্ণ নাম কীর্তন করা চাই"। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইনাই। আমার গুরুগিরির প্রয়োজন নাই। আমি যথার্থ শিষ্য হইতে চাই। "ওরে প্রকৃত শিষ্য হইলেইতো গুরুর অধিকার পায়। তুইতো বালক, কিছুই বুঝিস্ না"। আমার বুঝার দরকার নাই। আমি শাস্ত্র জানিনা। মূর্খ হইয়া পণ্ডিতদের সমানতা লাভ করিতে পারিব না। "ঋষিঋণ মুক্তির জন্য দীক্ষা দান করিতে হয়। গুরু

পরম্পরা রক্ষা করিতে হয়"। ঠিক আছে গুরু যাহাদের পাঠাইবেন তাহাদের বঞ্চিত করিব না। গুরুবাক্য পালন করিব।

॥ সাত ॥

১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর সাল। রাণীবাড়ী আশ্রমে ঠাকুর অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতা হইতে অনেক শিষ্যভক্ত ঠাকুর দর্শনে আসিয়াছেন। খবর পাইয়া আমিও গেলাম। সদ্‌গুরু সঙ্গ এবং ভক্তসঙ্গের প্রভাব অনেক। বত শিক্ষালাভ হয়। সেখানে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন, ধর্ম্মালোচনাও গ্রন্থপাঠ শুনিয়া মনের সংশয় দূর হয়, অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। আমি ডায়েরীতে ২০টা প্রশ্ন লিখিয়া লইয়া গেলাম। কিন্তু উত্থাপন করার সুযোগই পাইলাম না। কেননা ঠাকুর সর্ব্বক্ষণ ভক্তদের নিয়া ব্যস্ত। কখনও মৌন, কখনও সমাধিস্থ। অন্তর্য্যামী ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন বলিয়াইতো তাঁহার নাম "বাঞ্ছা কল্পতরু।" "একদিন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, এই যে আলোচনা হচ্ছে, কত কথাই তো বলে যাই, মনদিয়ে শুনলে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। গুরুকে প্রশ্ন করতে হয় না। কেবল মন দিয়ে শুনতে হয়। একই রকমের অনেক প্রশ্ন মনে জাগে। গীতায় মানুষের সবরকম প্রশ্ন এবং সমাধান আছে। আচ্ছা বলতো তোর সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে কি?" আমি তো এই প্রশ্ন শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। কি আর জবাব দিব? শ্রদ্ধানত হইয়া চুপ করিয়া গেলাম, চোখে জলের ধারা নামিল। ধন্য গুরু তুমি।

কলিকাতার প্রবীণ গুরুভ্রাতা ভগ্নীদের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় ঘটে। তার আগে ঠাকুরের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ হইত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মান্নার মারফতে। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সেনশর্ম্মা সাধক রামপ্রসাদ সেনের বংশধর এবং পরম গুরুভক্ত বিশ্বনাথদা মেদিনীপুর জেলার প্রখ্যাত বিপ্লবীদের একজন। সঙ্গীদের ফাঁসি হইয়া গেল। কিন্তু একমাত্র গুরু মৌনীবাবার প্রভাবে শেষ বিচারের দিনও ইংরাজ বিচারকের ভাবান্তর হইয়া গেল এবং বিশ্বনাথ সেনকে মুক্তি দিল। বিচারকের ঠিক পিছনের দেয়ালের মধ্যে অনেকেই গুরু মৌনীবাবাকে হাসিমুখে দাঁড়ানো দেখেন। বিশ্বনাথ সেনের মা ও বাবা ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ঠাকুরের চরণে

কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বিশ্বনাথ সেনের জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। গুরু বলেন, 'দেখি কি করিতে পারি।' সেই বিশ্বনাথ মুক্তি পাইয়া দীর্ঘকাল চাকুরী করিলেন। সংসারী হইলেন এবং এখন বৃদ্ধ হইলেও ঠাকুরের ধর্ম্মাদর্শ রক্ষা করিয়া প্রচারকার্য্যে রত আছেন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস সাধু, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্কের অফিসার এবং পরম গুরুভক্ত। ১১৮|৯ বিবেকানন্দ রোডের ফ্ল্যাট তিনতলায় ঠাকুরের আশ্রম করেন। ঠাকুর এখানেই বিশ্রাম করিতেন। পরম নিষ্ঠার সহিত হরিদা, ভাগ্নী মঞ্জু (অঞ্জলী) ঠাকুরের সেবা করিতেন। চিরকুমারী অঞ্জলা সাহা খুব ভাল পদাবলী কীর্ত্তন করে এবং ঠাকুরকে রাধাগোবিন্দ লীলাকীর্ত্তন শুনাইত।

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র বাড়ী মানিকতলায়। পরম গুরুভক্ত, বুদ্ধিমান এবং ঠাকুরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দাস, অঞ্জলী ও অঞ্জলীর মা এবং আমরা রাণীবাড়ীর শিষ্য ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার কাজে লাগিয়া গেলাম। সময় সময় ধর্ম্মালোচনা, সন্ধ্যায় অঞ্জলীর পদাবলী কীর্ত্তন এবং ঠাকুরকে লইয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মানুষও এই আশ্রমে আনন্দে যোগ দিতে থাকে। প্রেমিক গুরু মৌনীবাবার প্রভাব এইবার গ্রামবাসীরা অনুভব করিতে পারিল। এইবার কিন্তু তোষসাধু নন, বিস্ময়ের অবতার পরমপুরুষ। প্রেমভক্তির বন্যায় ভক্তরা ভাসিয়া যাইতেছেন। আমরা কোথায় আছি— বৃন্দাবনে, না নবদ্বীপে? ঠাকুরের সামনে বসিলে সংসার ছুটিয়া যায়। কেবল আনন্দ। তাই তো গুরু তাঁহার নাম দেন "সচ্চিদানন্দ।"

সকালবেলা জল খাবার শেষ হইলেই আমরা সকল কাজে লাগিয়া যাইতাম। আশ্রমের অনেক জায়গার ঘাস পরিষ্কার করিয়া, গাছেরপাতা জমা করিয়া স্থানে স্থানে যজ্ঞ করিতে হইত। রৌদ্রে কাজ করিতে করিতে একদিন খুব পিপাসা হইল জল খাইতে যাইব শুনিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন জল খাইলেই অসুখ করবে। আয় তোরা সব আয় আমার কাছে। কেউ জল খাবিনা। দেখ আমাকে অনুকরণ কর্। পিপাসা দূর হয়ে যাবে।" শীতলী কুম্ভকের শিক্ষা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদে

পিপাসা দূর হইয়া গেল এবং একটা যোগশিক্ষাও হইয়া গেল। দয়াল ঠাকুর আমাদের কৌশলে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকিত কেউ যেন বৃথা সময় নষ্ট না করে। সদ্‌গুরু সঙ্গলাভ সবসময় সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যখনই সুযোগ আসে আলস্য ত্যাগ করিয়া কিছু শিখিয়া যাও। যখন কোন কাজ নাই সকলে বসিয়া ওঁকার সাধন কর কিংবা যাহার যে ক্রিয়া করিবার কথা নিষ্ঠার সহিত বসিয়া যাও। পরমায়ু আর কতদিন? যেটুকু সময় আছে কাজে লাগাও।

গুরুসেবা কয়জনে করিতে জানে? গুরুসেবা বড় কঠিন। সকলে করিতে পারেনা, এত ধৈর্য্য সকলের নাই। একটু চাপ দিলেই গুরুভক্তি ছুটিয়া যায়। গুরু স্বয়ং শিষ্যের সেবা করেন। শিষ্যের হৃদয়ে গুরু আপন ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করেন, অথচ শিষ্যের খেয়াল নাই। গুরুকৃপা, গুরুকৃপা চলে। যখন গুরুকৃপা অনুভব হয়, শিষ্য জানেনা কিসে কি হইয়া গেল। তখন হয়তো সে পরমার্থ পথের অনেক দূর পৌঁছিয়া গিয়াছে। তবেই তো গুরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু। শিষ্যকে গন্তব্যে না পোঁ া নো পর্য্যন্ত গুরুর শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। এইজন্যই তো শিষ্য গুরুদত্ত একক্ষরের ঋণ কোটীজন্মেও পরিশোধ করিতে পারে না। শিষ্য উপযুক্ত হইলে মূলধন ফিরাইয়া দিতে পারে।

ঠাকুর একদিন বলিলেন, "তোমরা উদয়াস্ত কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর।" দিন ঠিক করা হইল এবং বাজারহাট শুরু হইয়া গেল। মাইকও আনিতে হইবে। ঠাকুরের আদেশ, আমার এই উৎসবের ম্যানেজার কেতকী।" আপত্তি উঠিল নানা কারণ দেখাইয়া। এখানে অনেক প্রবীণ ভক্তশিষ্য আছেন। ওর বয়স কম, বেশী পুরাতন শিষ্যও নয়। বিদেশে চাকরী করে, আচার-আচরণও ঠিক বৈষ্ণবোচিত নয়। কিছু লেখাপড়া জানিলে, কবিতা, গান লিখিলেই ভক্ত হওয়া যায়না, উপযুক্ততা আছে কিনা দেখা উচিত। কিন্তু কোন যুক্তি ঠাকুরের কাছে কার্য্যকরী হইল না। তাঁহার একই কথা— "সে আমার ম্যানেজার ' উৎসবের কাজ সে-ই করবে।"

কি আর করা যায়, অনেক অসন্তুষ্ট হইলেও উৎসবের কাজ শুরু হইয়া গেল। আগেরদিন রাত্রে অধিবাস। কীর্ত্তনীয়া দল আসিয়াছেন।

ঠাকুর আসন হইতে নামিয়া মণ্ডপে বসিলেন এবং সকলকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, "যাও ঘট ভরিয়া আন এবং পঞ্চতত্ত্বের আসন বসাইয়া কীর্ত্তন শুরু কর। মহাপ্রভু স্ব-পার্ষদ উপস্থিত হইয়াছেন। আর দেরী করিওনা।" কোথায় মহাপ্রভু, কোথায় পার্ষদভক্ত এইসব তখন বুঝে কে? যাই হউক কীর্ত্তন শুরু হইতেই ঠাকুর আসনে চলিয়া গেলেন।

এইদিকে কীর্ত্তন শুরু হইয়া খুব জমিয়া উঠিয়াছে। অপরদিক হইতে ঠাকুরের হুংকার ধ্বনি মাঝে মাঝে কানে আসিতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে আবার আদেশ "তোরা দুইএকজন ঘুমাবিনা শেষরাত্রে চতুর্থ প্রহরে প্রভাতীসুরে হরেকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন শুরু করতে হবে" আমরা কয়েকজন বসিয়া রহিলাম, তিনটা বাজতেই আবার বলিয়া ওঠেন, "ওরে সময় হয়েছে! তোরা কীর্ত্তন শুরু কর্।" আমরা গুরু প্রণাম করিয়া কীর্ত্তন শুরু করিলাম। ঠাকুর তন্ময় হইয়া শুনিতেছেন।

সময় ক্ষণের জ্ঞান তাঁহার এত বেশী যে আমাদের হাতে ঘড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ভুল করি। অথচ তিনি অন্ধকার গৃহে আসনে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটার পর একটা নির্দ্দেশ দিয়া যাইতেছেন।

৬টার সময় আমার প্রতি নির্দ্দেশ, "ওরা কীর্ত্তন করুক, তুই যা স্নান সেরে জল নিয়ে আয় এবং পঞ্চতত্ত্বের পূজা, বাল্যভোগ আহুতি ইত্যাদি শেষ করে কীর্ত্তনীয়া দল এবং ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ কর্বি। দুপুরে ভোগ আহুতি সব তুই কর্বি আজ।" কেন আপনি আহুতি করবেন না নাকি? "না, আজ তুই আমার ম্যানেজার। সব কাজ তোর হাতেই করতে হবে।" যেমন আদেশ তেমন কাজ।

গেলাম স্নানে আশ্রমের ব্রহ্মকুণ্ডে। ঠাকুর এইকুণ্ডে পা ধুইয়াছেন। এই পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া আমার শরীরের চর্ম্মরোগ সারিয়া গেল। স্নান করিয়া উঠিয়া এক কলসী জল লইয়া রওয়ানা হইলাম। সামনে বিরাট এক দমলা রং-এর কুকুর কপালে সাদা লোম, তিলকের মত। দেখিয়া মনে হইল এ কুকুর নয়। কোন মহাত্মা ছদ্মবেশে আসিয়াছেন মহাপ্রভুর উৎসবে। আমি হঠাৎ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম— তুমি যে-ই হও মহাপ্রভুর উৎসবে তোমার নিমন্ত্রণ। প্রসাদ নিয়ে যাবে।

আশ্চর্য্য সেই কুকুর আমার কথামত আমার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমে যাইয়া পূর্ব্বদিকের বারান্দায় বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল।

আমি পঞ্চতত্ত্বের পূজা, বাল্যভোগ, আহুতি দিয়া ঠাকুরের নির্দ্দেশমত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া যাইতেছি। প্রায় একশত মুসলমান নরনারী শিশু ও উপস্থিত এই উৎসবে। তাহারাও প্রসাদ চাহিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম কেননা আহুতির প্রসাদ সকলকে দেওয়া হয় না আদেশ দিলেন, "আজ আমার কোন মত নাই। তোর যাহাকে খুশী প্রসাদ দে।" জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকলেই মহাপ্রসাদ পাইতেছে পরমানন্দে। আনন্দের প্রেমের জোয়ার বহিতেছে আশ্রমে। কীর্ত্তনের আসরে কিছুক্ষণ ঠাকুর গিয়া বসিলেন। আমিও তাঁহার বামদিকে বসিলাম।

তিনি হুঁংকার দিতে লাগিলেন। মধুরকণ্ঠে কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র গোস্বামী ও সহ-শিল্পীবৃন্দ কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তদের মধ্যে ভাবের সঞ্চার হইলে কে কোথায় ঢলিয়া পড়িতেছে, কেউ কাঁদিতেছে, এক অপ্রাকৃত পরিবেশের সঞ্চার হইল। ঠাকুর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আমিও দুপুরের ভোগ, আহুতি, আরতির ব্যবস্থা করিতে গেলাম, যদিও শরীর অবসন্ন। ঠাকুরের একই কথা, "ওরে ভাব সম্বরণ করে চলো।" নবদ্বীপ লীলাগ্রন্থে পড়িয়াছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি এই উৎসবে। কেউ ভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে, নৃত্য করিতেছে, হাসি-কান্না চলিতেছে। হাজার হাজার নরনারী এই দৃশ্য দেখিয়া আজ বিস্মিত হইল। কে এই তোষসাধু? ইনি তো সাক্ষাৎ মহাপ্রভু। ম্যানেজারের দেহ কাঁপিতেছে। কিছুক্ষণ পাশে বসাইয়া রাখিলেন। একটু গুরুপূজা করার ইচ্ছা জাগিল। ফুল, চন্দন, তুলসী নিয়া আসিলাম এবং পূজা গ্রহণ করিলেন, চরণামৃত পান করিলাম। বাধা দিলেন না আজ। "কীর্ত্তনের আসরে যাবি না তুই। ভোগ আহুতি এখন শুরু কর্।"

আহুতি শুরু করিলাম। ঠাকুর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে আহুতি হচ্ছে না। একত্রে দুধে নুনে আহুতি দিতে নাই।" গেলাম কাছে এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলেন, "দেখ্, তো দুধে নুনে মিশে গিয়েছে। তাই তো কেউ ভোগ গ্রহণ করছেন না।" নজরে পড়িল,

খিচুড়ির সঙ্গে একই পাত্রে পায়েস দেওয়া হইয়াছে। যাই হোক আবার ভোগ নূতন করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল এবং পৃথক পৃথকভাবে আহুতি দিলাম ঠাকুরকে কাছে বসাইয়া। বলিলেন, "এইবার ঠিক হচ্ছে। দেবতা, ঋষি, যোগী, সিদ্ধগণ সকলেই আনন্দ করে খাচ্ছেন" আর মহাপ্রভু? তিনিও খাচ্ছেন। সকলের শুভদৃষ্টি পড়েছে আজ তোর উপর। ভালই হবে।"

হঠাৎ সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন, "রাধারাণী জোর করেছিলেন চলে যাবার জন্যে। গুরু এসে বাধা দিলেন। আরো কিছুকাল থাকবো তোদের মাঝে।"

আহুতি শেষ হইলে খুব খুশী হইলেন। আদেশ দিলেন আহুতির মহাপ্রসাদ সব খাদ্যে মিশাইয়া ভক্ত বৈষ্ণবদেরে প্রসাদ বিতরণ শুরু করা হউক। আগে কীর্ত্তনীয়া দলকে প্রসাদ দিতে হইবে যেহেতু একটু বিশ্রাম করিয়া আবার তাহাদের কীর্ত্তন শুরু করিতে হইবে। একদল বসিয়া অখণ্ড কীর্ত্তন চালাইয়া যাইবে। আদেশমত সবই চলিতেছে। আমি একটু বাইরে গেলাম।

কুকুরের ছদ্মবেশী মহাত্মা অধৈর্য্য হইয়া আমার সামনে উপস্থিত হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। হায় হায় তোমাকে মহাপ্রসাদ দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি আমার নিমন্ত্রিত। দাঁড়াও বাবা। খুব পরিপাটী করিয়া সব রকমের প্রসাদ নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলাম। তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বাবাজী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বড় দুঃখ পাইলাম। পরিচয় দিলেন না। পরে ঠাকুর বলিলেন, "ইনি ছিলেন মহাপ্রভুর সময়ের সিদ্ধবৈষ্ণব চরণদাস বাবাজী।" আমার দুঃখ দেখিয়া বলিলেন, "তুইতো ভাগ্যবান, তাঁকে প্রসাদ খাওয়ালি। তোকে তিনি দর্শন দিবেন ভবিষ্যতে। চিন্তার কি আছে?"

ঠাকুর প্রবোধ দিয়া বলেন, "এখন আমাকে মহাপ্রসাদ দে। তোরাও গ্রহণ কর"। ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রসাদ নেওয়ার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত এককণা মাত্র আমি গ্রহণ করিলাম। মহাপ্রসাদের কি মহিমা সকলে বুঝে না—

"গুরুপাদোদকং পেয়ং, গুরুর্যোচ্ছিষ্ট ভোজনং," সংসার রূপ মলনাশ হয়, ভক্তিলাভ হয় এবং অন্তে মুক্তিলাভ হয় বিশ্বাস করিয়া গুরুর পাদোদক এবং উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে।

রাত্রে কীর্তন পূর্ণা বা সমাপ্তি হইবে। কিন্তু ভক্তদের ভাবনা নষ্ট হইবে ভাবিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্তন চলিল। ঠাকুর আসন ছাড়িয়া কীর্তনের আসরে আসিলেন এবং কীর্তনের নিয়ম অনুসারে ম্যানেজারকে নিজের হাতে পুষ্পমালা পরাইয়া এবং চন্দনের তিলক দিয়া কৃষ্ণদাস সাজাইলেন। কৃষ্ণদাস তখন ঠাকুরের চরণে ঢলিয়া পড়িল এবং প্রকৃত বাহ্যজ্ঞান ফিরিল পরের দিন সকালবেলা।

ঠাকুরের প্রত্যেক লীলার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এই উৎসবে নবাগতা "গুরুদাসী" কুমারী অপর্ণা (শুক্লা) পঞ্চতত্ত্বের ও শ্রীগুরুর জন্য ফুলের মালা তৈরী করিয়া দিল এবং কীর্ত্তনের আনন্দ উপভোগ করিল। কয়েক বৎসর পরে ঠাকুর যখন আবার রাণীবাড়ী আশ্রমে আসেন তখন হইতে অন্তিম মহাসমাধি পর্যন্ত গুরুদাসী ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব পরম নিষ্ঠার সহিত পালন করিল।

আমার ছোটভাই শ্রীমান কুশীরঞ্জন সপরিবারে ঠাকুরের দীক্ষিত। সকলেই গুরু বলিতে অজ্ঞান। তাহার স্ত্রী গৌরী, পরমগুরুভক্তি পরায়ণা, ১৯৮৪ সালে অকালে গুরুধামে চলিয়া যায়। তাহার তিনকন্যা জয়া. ভক্তি. মুক্তি গুরুভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপা।

১৯৭৭ সালে শ্রীমান কুশীরঞ্জন সপরিবারে ইম্ফল হইতে রাণীবাড়ীতে আসে গুরুদর্শনের জন্য। ঠাকুর বায়না ধরিলেন তাহার সঙ্গে ইম্ফল যাওয়ার জন্য। প্লেনের টিকিট করা হইয়াছে তাহাদের স্বামী-স্ত্রী ও বাচ্চাদের জন্য। চেষ্টা করিলেও ঠাকুরের জন্য টিকিট পাওয়া গেল না। চলুন শিলচর এয়ার অফিসে। সেখানে জানা গেল কোন সিট্ খালি নাই। ঠাকুর না গেলে হয়তো তাহাদের ও যাওয়া হইবে না। ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "চল্‌রে প্লেনে উঠিয়া বসি"। "এতো সিটিবাস নয় যে উঠিয়া বসিব। আগে ব্যবস্থা হউক তো উঠিবেন। ঠাকুর বলিতেছেন,— "ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, চল উঠিয়া বসি"। তাঁহার বালকের মত কথা

শুনিয়া সকলেই হাসাহাসি করিতে লাগিল। প্লেন ছাড়ার সময় হইয়া গেল। কুশীরঞ্জনের মাথায় ঠাকুর বুদ্ধি দিলেন, আরে বাচ্চাদের টিকিট থাকিলেও মা বাবার কোলেই তো বসিবে। সিট্ দুইটা খালি পড়িয়া থাকিবে। বলা মাত্র এয়ার অফিসের লোকেরা অবাক হইয়া বলে এই বুদ্ধিতো আগে কাহারও মাথায় আসে নাই। অন্তর্যামী মহাপুরুষ সেই জন্যেইতো ব্যস্ত হইয়াছিলেন প্লেনে উঠিয়া বসার জন্য। যাই হউক সকলে মহাপুরুষকে প্রণাম জানাইয়া প্লেনে স-সম্মানে বসাইয়াদিল।

এয়ার হোষ্টেস্ চক্‌লেট্ দিতেছে যাত্রীদের। ঠাকুর শিশুর মত বলিয়া উঠিলেন, "ওরে কুশী বেশী করিয়া চক্‌লেট্ নিবি, বাসায় যাইয়া চক্‌লেটের চা বানাইয়া খাওয়া যাইবে"। বেচারী এয়ার হোষ্টেস্ গোপালের জন্য অনেকগুলা চকলেট দিয়া হাসিমুখে অন্যযাত্রীদের কাছে চলিয়া যায়।

ইম্ফলে পৌঁছিয়া ও অনেক লীলা করিয়াছেন। স্বামী নিগমানন্দের আশ্রিত শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ মুখার্জী (খুকু মুখার্জী) ঠাকুরের মহিমা শুনিয়া ও ফটো দেখিয়াই খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার আন্তরিক বাসনা পূর্ণ করার জন্যই বোধহয় ইম্ফলে আগমন। একদিন কুশীকে বলিলেন, "চল্ আজ শহরে একটু বেড়াইয়া আসি"। কিছুদূর গিয়া বলিলেন, "বাজারে চল্। তোর মুখার্জীদার দোকানে একটু বিশ্রাম করব।" মুখার্জীদার দোকানে পৌঁছিলে মুখার্জীদা জয়গুরু মহানাম জপ করিতে করিতে ভাবাবেগে ঠাকুরকে নিজের গদিতে বসাইলেন এবং প্রণাম করিলেন, সজল নয়নে হৃদয়ের আর্ত্তি জানাইলেন। ঠাকুর উঠিয়া পড়িলেন, 'আজ চলি। কাল তোমার বাড়ীতে আহুতি হবে। এখন ভাবতে হবেনা তোমাকে"। মুখার্জীদা তো অবাক। তুমি সত্যসত্যই অহেতুক কৃপাসিন্ধু হে ঠাকুর।

পরদিন ভোরে ৭টার মধ্যে মুখার্জীদার বাড়ীতে গিয়া হাজির। "খোকন আমরা এসে গেছি।" বাজার থেকে কিছু কাটাসব্জী নিয়ে এসো। একসিদ্ধ হবে। আর একটু পায়েস। তুমি নিজে রান্না করবে।" আদেশ শুনিয়া মুখার্জীদার চোখে আনন্দাশ্রু। অতি সংক্ষেপে ভোগের আয়োজন করা হইল যেন অমৃত। ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করিলে সকলে প্রসাদ গ্রহণ

করিলেন। "চলরে ভাই এখন উঠি।" মুখার্জীদার অভীষ্ট পূর্ণ হইল এবং কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুধামে পৌঁছিলেন।

ইম্ফলে অনেক পরিবারের মঙ্গল হয়। হঠাৎ কাহারও বাসায় যাইয়া উঠিতেন আবার কেউ সাধিয়াও নিতে পারে নাই। মহাপুরুষের মহিমা অনেক ভক্তিমান অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন আবার কয়েকদিন পর বায়না ধরিলেন প্লেনে কলিকাতা পৌঁছানোর জন্য। ভাই কুশী চিন্তায় পড়িল। তবে টাকার ব্যবস্থা করিয়া প্লেনের টিকিট লইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া আসিল। তাহার অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে এই বাবদে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সীমিত অর্থ ব্যয় করিয়া তেমন অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। কিন্তু ব্যাগে ডায়েরীর ভিতর আটখানা একশত টাকার নোট পাওয়া গেল। এই রহস্য আজও অজ্ঞাত। মোট খরচ নাকি আটশত টাকার কমই হইয়াছিল। ভক্তকে আর্থিক কষ্ট থেকে বাঁচাইলেন।

কুশী বলিয়াছে, ইম্ফলে থাকাকালীন সকালবেলা গৌরী ছোট ডেগে অল্পই ভাত রান্না করিত। ঠাকুর আহুতি করিতেন এবং এই ভাত হইতেই সকালে দিনে ও রাত্রে প্রসাদ পাইত। বাহিরের ভক্তরা আসিলেও বলিতেন, "সকলকে অন্ন প্রসাদ দে, পেট ভরিয়া খাইতে দে," অথচ পাত্রটির অন্ন কম হইত না।

আশ্রমেও দেখিয়াছি প্রসাদ হয়তো অল্পই আছে। কিন্তু যত ভক্তই আসুক এই পাত্র হইতে পরিবেশন করা হয়। সামান্য প্রসাদেই সকলের পরিতৃপ্তি। আমি নিজেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কতবার।

ঠাকুর হাওড়া কলিকাতার বিভিন্ন জায়গায় কয়েক বৎসর থাকিয়া ১৯৮২ ইংরাজীতে শেষবারের মত রাণীবাড়ী আশ্রমে আসেন। ভাই কুশীরঞ্জন সপরিবারে ঠাকুর দর্শনে কলিকাতা যাইয়া ফিরিবার পথে কামরূপ এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনায় পড়িয়া বাঁচিয়া যায় এবং বাচ্চাদের নিয়া অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসে শুধু গুরু পাদুকার মহিমায়। সামনের কামরা পড়িয়া যায় এবং বহু লোক হতাহত হয় গুরুদেব আমাকে বলেন, কুশী একমাত্র গুরুভক্তির জোরে এতবড় ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়িয়াও বাঁচিয়া গেল। গুরুপাদুকা সঙ্গে থাকিলে কোন ভয় নাই। মূর্খেরা গুরুগীতা মানে না। জগদগুরু

শিবের বাক্য মিথ্যা নয়। "গুরো'ধ্যানাৎ তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময় ভবেৎ।"

ঠাকুর পরম করুণাময় আমার স্ত্রী ও সন্তানকে ইম্ফলে কিভাবে রক্ষা করিলেন একটু প্রকাশ করিতেছি। ১৯৭২ সালে আমার স্ত্রীর 'এক্লেম্‌শিয়া' হইয়া ইম্ফল হাসপাতালে মরণাপন্ন। আমার ছোট মেয়ে অঞ্জনার (উমা) জন্মের কয়েকদিন আগে। আমরা আশা ছাড়িয়া দিয়াছি। বড়মেয়ে রঞ্জনা (ঝুমা) ও ছেলে কিশলয় (রাজু) কে নিয়া আমি একেবারে বিব্রত। ঘরে কেউ নাই যে আমাকে সাহায্য করিবে বা আমার শিশু দুইটিকে তদারকি করে। কেবল ঠাকুরকে ডাকি। দুর্গামন্দিরে হাসপাতালে যাওয়ার সময় একটা প্রণাম করিয়া প্রার্থনা জানাই যেন মা ও সন্তান উভয়েই রক্ষা পায়। ছেলে হইলে শিব এবং মেয়ে হইলে নাম রাখিব উমা। শিবগুরুর কৃপায় আমার স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই জীবন রক্ষা হইল এবং গুরুভক্তি বাড়িয়া গেল।

যে রাত্রে রোগিনীর মৃত্যু হওয়ার কথা, সেই রাত্রিতে অপূর্ব্ব স্বপ্ন হইলেও বাস্তব দর্শন হইল। আমার স্ত্রীকে মরফিয়া দিয়া রাখা হয় যদি একটু ঘুম হয়। গুরুদেব চারজন মহাপুরুষকে সঙ্গে নিয়া হাসপাতালে রোগিনী শিষ্যার কাছে যান। স্ত্রীর বর্ণনা অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হয়তো নিগমানন্দ স্বামী এবং উলঙ্গ হইবেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীযুক্তা ডলি চক্রবর্ত্তী (ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু) ভোগ রান্না করেন এবং ঠাকুর আহুতি দিয়া সকলের সঙ্গে ভোগ গ্রহণ করেন। রোগিনী শিষ্যাকে কোলে লইয়া প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন একটু এবং সকলে আশীর্ব্বাদ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রোগিনীর খুব ভাল ঘুম হইতেছে দেখিয়া ডাক্তার, নার্স সকলেই অবাক। আমি ভোরবেলা চা ও জল খাবার লইয়া হাসপাতালে গেলে ডাক্তার ও নার্স বিস্ময় প্রকাশ করেন। রোগী তো একেবারে সুস্থ। It's a miracle অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমি রোগিনীকে জাগাইলাম ও কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "আমি আজ সুস্থ। আমাকে বাসায় নিয়া চল।" ডাক্তারের পরামর্শে বাসায় নিয়া গেলাম এবং কথা রহিল প্রসব বেদনা একটু বুঝিতে পারিলেই হাসপাতালে নিয়া আসিতে হইবে। কয়েকদিন পরে জগজ্জননী 'উমা'কে

মায়ের কোল ভরিয়া ঘরে পাঠাইলেন। এই মেয়ের জন্মের একমাস পূর্ব্বে হঠাৎ আমার মধ্যে কবিত্বশক্তির বিকাশ হয় এবং কবিতা, গান লিখিতে শুরু করি। ঠাকুর তাহাকে হনূমানের মা বলিতেন। আর বলিতেন, "তোর বড়মেয়ের মধ্যে মীরাবাঈ রহিয়াছে।" ওর ভজন শুনিলেই ঠাকুরের সমাধি হইত।

॥ আট ॥

কিছুদিন যাবৎ সন্ন্যাস নিবার বড় ইচ্ছা। সংসারের ঝামেলা আর সহ্য হয় না। কবিতা, গান অনেক লিখিয়াছি। একখানা গানে লিখিলাম— "ও সন্ন্যাসী বলে দে মোরে, মায়াজালের শক্তবেড়া, ভাঙ্গলী কেমন করে।" ঠাকুর অভিপ্রায় বুঝিয়া উপদেশ দিলেন, "সংসারের ঝামেলা হইতে দূরে পলায়ন করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সংসারও ভগবানের। কেউ সন্তান পায় না মানত করিয়াও। আর কেউ পাইয়াও অনাদর করে। সংসার বন্ধনের কারণ নয়। অজ্ঞানতা, সংসারাসক্তি বন্ধনের কারণ। নিজের সংসার সামলাইতে পারেনা, মুখে বড় বড় কথা, গুরুসেবা, ভগবৎ সেবা, সমাজ ও দেশের সেবা। ভগবৎ সেবা জ্ঞানেই পরিবারের পালন পোষণ করিতে হয়। ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইয়া বিবেক বৈরাগ্য জাগিলে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মতঃ জীবন যাপন ও পরমার্থ লাভ করা যায়। কলিযুগে তন্ত্রমতে কৌলাচার পন্থায় সংসারে থাকিয়াও অবধূত সন্ন্যাসী হওয়া যায়। অবধূত সন্ন্যাসীকেও পরমহংস বলা যায়। কুলাবধূত শিব স্বরূপ।" সুতরাং সন্ন্যাসী হওয়ার স্বপ্ন মন হইতে দূর হইয়া গেল। আবার সংসারে মজিয়া গেলাম। তবে গুরু রক্ষা করিতেছেন। নৌকা ডুবে ডুবে অবস্থায়ও বাঁচিয়া যাই। বুঝিলাম গুরুর ইচ্ছাই সব। আমার ইচ্ছাতে ভবে কিছুই হবে না।

১৯৭৯ সনের মে মাসে সপরিবারে গেলাম ঠাকুরের কাছে কলিকাতায়। উদ্দেশ্য ছিল পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিব। ঠাকুর বাধা দিলেন। এই গরমে বাচ্চারা অসুস্থ হইয়া পড়িবে। হরিদার ফ্ল্যাটে সপরিবারে থাকার অনেক অসুবিধা আছে। ঠাকুরই উপায় করিয়া দিলেন।

একদিন বিকালবেলা আমার সম্বন্ধিক শ্রীযুক্ত প্রণবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরাট

মায়ের কোল ভরিয়া ঘরে পাঠাইলেন। এই মেয়ের জন্মের একমাস পূর্ব্বে হঠাৎ আমার মধ্যে কবিত্বশক্তির বিকাশ হয় এবং কবিতা, গান লিখিতে শুরু করি। ঠাকুর তাহাকে হনূমানের মা বলিতেন। আর বলিতেন, তোর বড়মেয়ের মধ্যে মীরাবাঈ রহিয়াছে। ওর ভজন শুনিলেই ঠাকুরের সমাধি হইত।

॥ আট ॥

কিছুদিন যাবৎ সন্ন্যাস নিবার বড় ইচ্ছা। সংসারের ঝামেলা আর সহ্য হয় না। কবিতা, গান অনেক লিখিয়াছি। একখানা গানে লিখিলাম— "ও সন্ন্যাসী বলে দে মোরে, মায়াজালের শক্তবেড়া, ভাঙ্গলী কেমন করে।" ঠাকুর অভিপ্রায় বুঝিয়া উপদেশ দিলেন, "সংসারের ঝামেলা হইতে দূরে পলায়ন করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সংসারও ভগবানের। কেউ সন্তান পায় না মানত করিয়াও। আর কেউ পাইয়াও অনাদর করে। সংসার বন্ধনের কারণ নয়। অজ্ঞানতা, সংসারাসক্তি বন্ধনের কারণ। নিজের সংসার সামলাইতে পারেনা, মুখে বড় বড় কথা, গুরুসেবা, ভগবৎ সেবা, সমাজ ও দেশের সেবা। ভগবৎ সেবা জ্ঞানেই পরিবারের পালন পোষণ করিতে হয়। ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইয়া বিবেক বৈরাগ্য জাগলে সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন ও পরমার্থ লাভ করা যায়। কলিযুগে তন্ত্রমতে কৌলাচার পন্থায় সংসারে থাকিয়াও অবধূত সন্ন্যাসী হওয়া যায়। অবধূত সন্ন্যাসীকেও পরমহংস বলা যায়। কুলাবধূত শিব স্বরূপ।" সুতরাং সন্ন্যাসী হওয়ার স্বপ্ন মন হইতে দূর হইয়া গেল। আবার সংসারে মজিয়া গেলাম। তবে গুরু রক্ষা করিতেছেন। নৌকা ডুবে ডুবে অবস্থায়ও বাঁচিয়া যাই। বুঝিলাম গুরুর ইচ্ছাই সব। আমার ইচ্ছাতে ভবে কিছুই হবে না।

১৯৭৯ সনের মে মাসে সপরিবারে গেলাম ঠাকুরের কাছে কলিকাতায়। উদ্দেশ্য ছিল পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিব। ঠাকুর বাধা দিলেন। এই গরমে বাচ্চারা অসুস্থ হইয়া পড়িবে। হরিদার ফ্ল্যাটে সপরিবারে থাকার অনেক অসুবিধা আছে। ঠাকুরই উপায় করিয়া দিলেন।

একদিন বিকালবেলা আমার সম্বন্ধিক শ্রীযুক্ত প্রণবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরাট

পণ্ডিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক, সীতারাম দাস ওঁংকার নাথের শিষ্য আমাদের খবরে আশ্রমে আসিলেন ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে ওঁংকার সাধন করাইয়া শক্তি সঞ্চার করিয়া দিলেন যেহেতু তিনি অপত্য স্থানীয়। পণ্ডিতের জীবন ধন্য হইয়া গেল। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। এখানে আশ্রমে বাচ্চাদের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া সম্বন্ধিক মহাশয় তাহাদেরে নিজের বাড়ীতে শ্যামনগরে লইয়া গেলেন। তাহারা রক্ষা পাইল এবং নিত্য গঙ্গাস্নান, মামার বাড়ীতে স্নেহযত্ন পাইয়া ভুলিয়া গেল।

আমরা শুধু কালীঘাট ও অন্যান্য জায়গায় কিছু ঘুরিলাম। পুরীতে যাওয়া হইল না। কালীঘাটে যাইতেও ঠাকুর বারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী বলে, লোকে কি বলিবে? কলিকাতায় এতদিন থাকিয়াও কালীঘাটে মাকে দর্শন না করিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। গেলাম কালীঘাটে। পাণ্ডাকে ঘোষ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মানুষের ভিড়ে গরমে ছোটমেয়ের প্রাণ যায় যায়। কোনরকমে মন্দিরের বাইরে আসিয়া যেন প্রাণে বাঁচিলাম। ঠাকুর বারণ করাসত্বেও আসিয়া এত কষ্ট ভোগ। দুঃখ হইল, এইকি মায়ের দর্শন? কি দেখিলাম? না আর কোথাও যাইব না। গুরুর ইচ্ছা থাকিলে মা ঠিকই দর্শন দিবে। এত কষ্ট করিয়া পাথরের মূর্ত্তি দর্শনে আর যাইব না কোথাও।

মাতৃসংগীত লিখিলাম –

আমার ইচ্ছাতে ভবে কিছুই হবেনা
এ সত্য তুই বুঝিয়ে দিলি দয়াময়ী মা ॥
মন্দিরে তোমার আরতি
শুনি বাজে সন্ধ্যারতি,
তব দরশনে যেতে
মন কেন মা চায় না ॥
আজ দেখি তোর বড় দয়া
ডেকে নিলি মহামায়া
তোর পাষাণ মূর্ত্তি দেখে
মাগো মন ভরেনা ॥

যদি মোরে বাসিস্ ভালো
হৃদয় করিয়া আলো
বিরাজ চিন্ময়ী রূপে
করনা মা ছলনা ॥

মাতৃমন্দিরের পাশে একটা ঘরে একটু বিশ্রাম ও পানীয় জলের আশায় গেলাম। "কুপুত্র অনেক হয়মা, কুমাতা নয় কখনো তো" না চাহিতে এক অতিবৃদ্ধা মহিলা দুই হাত দিয়া ধরিয়া একঘটি জল ও কয়েকখানা সন্দেশ লইয়া উপস্থিত। বৃদ্ধার হাত কাঁপিতেছে। কাঁপাকাঁপা কণ্ঠস্বরে বলিলেন, "বাবা গো বড় জলতেষ্টা পেয়েছে বুঝি, সন্দেশটুকু ও জল খেয়ে একটু বিশ্রাম করো"। প্রাণ বাঁচিয়া গেল। বুঝিলাম গুরু ও মা কালীর কৃপা। বৃদ্ধাকে দুইটাকা দিয়া প্রণাম করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিলেন, আমরা টোক্সিতে উঠিলাম।

ঠাকুরের কাছে যাইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কোথা থেকে আসা হল"? "বলিলাম, "কালীঘাটে গিয়াছিলাম," "বারণ করলাম তবুও গেলি? বেশ কষ্ট হয়েছে মনে হয়। কি দেখলি ওখানে? মায়ের দেখা পেলি? লজ্জায় দুঃখে আমি নাই। জবাব নাই আমার। গুরুবাক্য লঙ্ঘন। "বউএর কথায় গেলি। যাক্ বৃদ্ধা তবুও কৃপা করেছে"। আগে যদি একটু বুঝিতাম তবে বৃদ্ধার পা ছাড়িতাম না।

শ্যামনগরে সকলকে পৌঁছাইয়া দিয়া আমি ঠাকুরের সঙ্গেই আছি। গুরুই জগন্নাথ। পুরীতে কি দেখিব? দৃষ্টি খুলিয়া না দিলে কোন দর্শনই হইবে না। এখানে আমিও ঠাকুর ভাবিলাম সুযোগ যখন পাইলাম তবে একটু গুরুসেবা করি। এতকাল গুরুকে জ্বালাতন করিয়াছি। তিনি নীরবে সহ্য করিয়াছেন। এইবার তাঁহার সুযোগ। স্নেহের শাসন। গুরুভক্তি ছুটিয়া যায়। পালাইতে পারিলেই বাঁচি। সাধু সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা নয়। ঠাকুর বলেন; রামদাস কাঠিয়া বাবা, শিষ্য বা চেলার কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এমন মহাসাধক নৈষ্টিক গুরুভক্ত জগতে বিরল। আমি তো শিষ্যদের কোন কষ্ট দেই নাই। যদি কেউ শিষ্য হইতে চায়, পরমার্থ লাভ করিতে চায়, তবে যে কোন অবস্থার

সম্মুখীন হইতে ভয় পাইবে কেন ? সংসারী মানুষের পরমার্থ পথে চলিতে হইলে সময় সময় সদ্‌গুরু সঙ্গ কিছুকাল নির্জনে বাস করা অর্থাৎ পারিবারিক জীবন হইতে সরিয়া থাকিয়া সাধন ভজন করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যোগ শিক্ষার্থীর স্ত্রী সঙ্গ, অত্যাধিক আহার, পরিশ্রম, অত্যাধিক নিদ্রা প্রভৃতি বর্জন করিতে হইবে। নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয়।

যাই হউক, শিষ্যের মঙ্গলার্থে ট্রেনিং সুরু হইল। মাথার উপরে ৫৬ ইঞ্চি পাখা ঘুরিতেছে তবুও নাকি গরমের জ্বালা সহ্য হইতেছে না। সন্ধ্যা হইতে হাত পাখার বাতাস করিতে করিতে রাত ১টা বাজিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কয়টা বাজে' ? ঘড়ি দেখিয়া বলিলাম. ১টা বাজে'। "তোর বড় কষ্ট হইয়াছে। আমার শরীর এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে। এখন তুই শুইয়া পড়। উঠবি সকাল। পাকায় একখানা চাদর বিছাইয়া মাথার নীচে বালিশের পরিবর্ত্তে একটা বস্তা ভাঁজ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম লাগিয়াছে মাত্র। ৩টায় ডাকিয়া উঠাইলেন। হাত ধুঁইয়া আসিয়া যোগক্রিয়া করিতে হইবে। তুলসী দাসের দোঁহা—

"পয়লা প্রহর মেঁ সব কোই জাগে
দুসরা প্রহর মেঁ ভোগী,
তিসরা প্রহর মেঁ তস্কর জাগে
চৌথা প্রহর মেঁ যোগী।

চতুর্থ প্রহরে যোগী ঋষিরা ঘুরিয়া বেড়ান এবং সাধকদের অনেক সাহায্য করেন। সিদ্ধপুরুষরা জীবজগতের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এবং যাহারা পরমার্থ পথে চলে তাহাদের নানাভাবে সাহায্য করেন এইজন্য চতুর্থ প্রহরে উঠিয়া জপ, যোগাদিক্রিয়া, যাহার যাহা নির্দিষ্ট, নিষ্ঠার সহিত করিতে হয়। কয়েকদিন বেশ কষ্ট হইয়াছে। এরপর অভ্যাস হইয়া গেল। ২ / ৩ ঘণ্টা ঘুমাইলে যথেষ্ট মনে হইত। রাত্রে পেট ভরিয়া খাবার খাওয়া উচিত নয়। রাত্রে না খাওয়াই উচিত। না পারিলে সামান্য কিছু গ্রহণ করিতে পার।

রৌদ্র উঠিয়া গেলে গীতা, উপনিষদ্ পাঠ। তারপর জল খাবার

আহুতির ব্যবস্থা। দুপুরে যেমন আয়োজন স্থানীয় ভক্তরা করেন। কোন কোন দিন আমার জন্য ভিক্ষা করিতেন আমাকে সঙ্গে লইয়া। একদিন বেলা ১২টা বাজিয়াছে। বলেন, আজ তোর ভিক্ষা হইবে সীমলাষ্ট্রীটের বিশ্বনাথ সেনের বাড়ীতে। একটা রিক্সাতেই হবে"। আমাকে বসাইলেন বামদিকে। গুরু বসিবেন ডানদিকে এটাই নিয়ম। পেঁছিলাম বিশ্বনাথ সেনের বাড়ীতে। মেয়েলোকেরা উলুধ্বনি ও শঙ্খ বাজাইয়া গুরুদেবকে স্বাগত জানাইলেন। ঠাকুর একটা চেয়ারে বসিয়া তামাক চাহিলেন। আমার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন, "আজ আমার নাতির ভিক্ষে তোদের এখানে"। আসলে সেইদিন মেয়েরা কিসের ব্রত করিয়াছিল। নানা রকমের পিঠা, সন্দেশ তৈয়ার করিয়াছিল। আমি আহুতি দিয়া প্রসাদ নিলাম এবং ঘরের সকলে প্রসাদ পাইল। ঠাকুরের তামাক খাওয়া ও আমার ভোজন শেষ হইলে আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

ঠাকুর আহুতি দিতেন বিকালের দিকে এবং সামান্য গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রসাদ ভক্তদের দেওয়া হইত। রাত দশটা / সাড়ে দশটা পর্যন্ত ভক্তরা থাকিতেন এবং ঠাকুরের উপদেশ শ্রবণ করিতেন। ঠাকুরকে আমি কখনও ঘুমাইতে দেখি নাই। তাঁহার দিনরাত সমান। রাত্রে আসনে সমাধিস্থ, কখনও পায়চারী করিতেন। ব্রহ্মানন্দ উপভোগের জন্য নিদ্রা যাইতেন না। আর আমরা কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়া ও খুশী হইনা। দিনে ও ঘুম রাত্রেও ঘুম।

রাত্রে ভক্তরা বিদায় নিলে আমার ট্রেনিং শুরু হইত। এক রাত্রে বিপদে পড়িলাম। আশ্রমে শুধু ঠাকুর ও আমি রহিলাম। হরিদা, বিশ্বনাথদা সকলেই চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার দিকে একটা বড় থালাভর্তি আমের ভোগ দেওয়া হয়। কোন ভক্তের দৃষ্টি পড়িয়াছে সেই আমে। তাই আমের প্রসাদ ভক্তদেরে না দিয়া ঠাকুর নিজেই গ্রহণ করিলেন। রাত্রে পায়খানা করিলেন ধুতির মধ্যেই আসনে বসিয়া। আমাকে বলেন একখানা গামছা দিতে। গামছা পরিয়া আমাকে পায়খানা করা ধুতি ধুইয়া আনিতে বলিলেন। আমি বাচ্চার পায়খানা ও সহ্য করিতে

পারিনা। আজ তো বড বিপদে পড়িলাম। অথচ না করিয়া উপায় নাই। ঠাকুর কি বিপদে ফেলিলেন। ইহা আবার কোন পরীক্ষা কে জানে? হয়তো আমার ঘৃণা দূর করার জন্য এই অভিনয়। তাহাই ঠিক। বাথরোমে নিয়া তো ভয়ে ভয়ে ধুতি খুলিয়া দেখি যে সব আম খাইয়াছিলেন তাহাই বাহির করিয়া দিয়াছেন. মলের কোন চিহ্নমাত্র নাই এবং এক সুগন্ধে আমি মোহিত হইয়া গেলাম। শিব গুরুর অলৌকিক ব্যাপার ভাবিতেছি বসিয়া। আবার ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিতেই নানা কথা, উপদেশ শুরু করিয়া দিলেন। একটু ভাব তন্ময়তা আসিলেই ভুলাইয়া দিতেন। এখন ভাবের সময় নয়। কেবল কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। গুরুকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়। ভাব গোপন করিয়া চলিতে হয়। যখন সময় হইবে, কর্ম্ম শেষ হইয়া যাইবে, তখন আর বাধা নাই।

হরিদা বাজার করিতে গিয়াছেন। বেলা বোধহয় ৯টা হইবে। আমি গীতাপাঠ করিতেছি। এক যুবক চোর বা ডাকাত আসিয়া বলে, "হরিবাবু বলেছেন পাখাগুলো ঠিক করে দিতে। উনি কোথায়"? জবাব দিলাম, "বাজারে গেছেন। আমাদের কিছু বলে যাননি। তাকে আসতে দিন। তারপর পাখা খুলতে হয় খুলবেন।" শ্রীমান কিন্তু পাখা খুলিয়া পলায়নের চেষ্টায় আছে। ঠাকুর আমাকে বলেন, "তুই উঠবি না আসন থেকে। গীতাপাঠ করে যা। আমি দেখছি," বলিয়া যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। ছেলেটির ভাবান্তর হইয়া গেল "আবার আসব" বলিয়া চলিয়া গেল এবং যাওয়ার সময় আমার ঘড়িটা নিয়া গেল। ঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন, "তোর একটু ক্ষতি হইল, আরেকটা ঘড়ি কিনিয়া লইবি।" সে নিলে তো অনেক কিছুই নিয়া যাইতে পারিত এবং ছোরাও বুকে বসাইতে পারিত. প্রভু রক্ষা করিয়াছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে হরিদা এবং আরও ভক্তরা আসিয়া ঘটনা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা আজ রক্ষা করেছেন যোগবিভূতিদ্বারা নইলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত"।

ঠাকুরের কাছে কয়েকদিন থাকিয়া কষ্ট হইলেও এমন একটা আনন্দ অনুভব করিতাম যে ছাড়িয়া আসিতে মন চায় না। ছুটী শেষ হইয়া গেল।

কর্ম্মস্থলে ফিরিবার পালা। দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতেছে। "ওরে আগে ধর্ম্ম শেষ করো তারপর সব হবে। ধর্ম্মার্থীকে ভগবান রক্ষা করেন। গীতায় কি পড়লি—

"নিবসন্তি সদা দেহে, দেহশেষে অপি সর্ব্বদা,
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকা ॥"

রমেশ ঠাকুরের মত এত নবাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কোন মহাপুরুষ করেন নাই। তবুও নারী জাগরণ হইল না। এই দুঃখ। নারী জাগরণ খুব দরকার। এই রোগগ্রস্ত সমাজকে নারীরাই বাঁচাইতে পারে, রক্ষা করিতে পারে মাতৃত্বের পবিত্রতায়; ভগ্নীর স্নেহ মমতায় এবং স্ত্রীর সহযোগিতায়। কত কঠোর তপস্যা করিয়াছি হিমালয়ে এবং লোকালয়ে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোদের তেমন কিছু করিতে হইবে না। কেবল আমার কাজ করিয়া যাইবি। আমার বাক্যে বিশ্বাস করিলে আর তোদের চিন্তা নাই। ভগবানের নিকট হইতে চাপরাশ লইয়া আসিয়াছি।

কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি কেউ প্রশ্ন করে তোমাদের গুরু গৃহী না সন্ন্যাসী তবে জবাব কি দিব? "আমি তো নিজেই জানিনা আমি কি? গৃহস্থ বৈষ্ণব বলিতে পার, আবার বলেন কৌলাচারী অবধূত বলিতে পার। অবধূত ও সন্ন্যাসী। আমার তো তুলসীর মালা, রুদ্রাক্ষ সবই ছিল। আমার হরিহরের উপাসনা," আপনি দীক্ষা দিয়া বলিলেন, তুলসীর মালা ধারণের জন্য। ধারণ করিলাম। আবার দিলেন রুদ্রাক্ষের মালা। লোকে তো হাসে, নানারকমের প্রশ্ন করে। যাহারা শিবকে অবজ্ঞা করে আর বিষ্ণুকে পূজা করে তাহারা নরকগামী হয়। আবার বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করিয়া যাহারা শিবের পূজা করে তাহারাও নরকগামী হয়। হরি ও হর অভিন্ন। উভয়েই বৈষ্ণব। মাও পরমা বৈষ্ণবী। এইসব তত্ত্ব বুঝিলে হিন্দুদের মধ্যে এত বৈষম্য এত মতবাদ থাকিত না।

ধর্ম্মের গ্লানি এইভাবেই হইতেছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈবেও ঝগড়া। বৈষ্ণবের মধ্যেও হাজার মত। তারপর ছোটবড় জাতবিচার। এইসব করিয়াই তো মুসলমান ও খৃষ্টানদের সৃষ্টি ও সংখ্যা বৃদ্ধি। এখনও সময় আছে, সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে চলিলে জীবন সুন্দর হইবে। হিংসা বিদ্বেষ,

কু-সংস্কার, জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলিয়া স্ব-ধর্ম্মের আচরণ করিলে সনাতন ধর্ম্মের ধ্বজা সবার উপরেই আকাশে উড়িবে। জগতের যত জ্ঞান, বিজ্ঞান নিয়া মাতামাতি চলিতেছে সবই সনাতন শাস্ত্রের অন্তর্গত। বিদেশীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া বিদেশী ভাষায় বইপত্রে যে সিদ্ধান্ত দিতেছে, তাহা পড়িয়া সকলেই অবাক হইতেছে। অথচ জানে না বা বিশ্বাস করিতে চায় না যে আমাদের বেদেই এইসব কিছুর সূত্র ছিল বা আছে। ঋষিরা, মহাসিদ্ধরা অনুমানের উপর ভরসা করিয়া কিছু বলেন না, যাহা কিছু তাঁহাদের সাধন সিদ্ধ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

দেখ, চিত্ত শুদ্ধি হইলে তোমার দৃষ্টিতে সবই সুন্দর পবিত্র এক সং পদার্থ আত্মোপলব্ধি হইবে। ভগবানের সৃষ্টি অমূলক নয়। সত্ত্বঃ রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের অধীন হইয়া মানুষের জীবন যাত্রা। সৎ চিন্তা, সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব, বিবেক, বৈরাগ্য, শুবুদ্ধি জাগরিত হয়। তারপর মানুষের বিচার বুদ্ধি ও সংগঠন মূলক হয়। নিজের স্বার্থটাকে বড় করিয়া দেখিলে জনকল্যাণ মূলক কিছুই করা সম্ভব নয়। কিছু পাইতে হইলে কিছু দিতে হয়; কিছু ত্যাগ করিতে হয়।

ঠাকুরকে একদিন এক শিক্ষিত যুবক ইংরাজীতে ভণ্ড তপস্বী ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করে। ঠাকুর আগের দিনের ইংরাজী স্কুলে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। আমাকে বলেন, "তুই তো ইংরাজী আমার চেয়ে বেশী পড়িয়াছিস্। কয়েকটা ইংরাজী শব্দের অর্থ বলতো? ওরে আমিও কিছু কিছু বুঝি। ছোকরা ভাবিয়াছে এই বৃদ্ধ সাধু কিছুই জানে না" ঠাকুর ইংরাজী, হিন্দী, ভোজপুরী, পাঞ্জাবী বহুভাষা জানিতেন। যে পুরুষ ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝেন, তিনি মানুষের ভাষা বুঝিবেন না কেন? ভগবান সকলের ভাষাই বুঝেন। যে যে ভাষায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়, ভগবান না বুঝিলে কি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেন? ডিগ্রী থাকিলেই বিদ্যালাভ হয় না। জাগতিক বিদ্যাকে অবিদ্যা বলে। আসল বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা। কয়জনের সেই বোধ আছে।

তত্ত্বতঃ গুরু সকলেই এক। কুলকুণ্ডলিনী যাহার জাগিয়াছে তিনি

গুরু হইতে পারেন। ত্রিবিন্দু, ত্রিরেখা ভেদকরা সকলের সাধ্য নয়। সাধন সাপেক্ষ। উপযুক্ত সদ্‌গুরুর কৃপা সাপেক্ষ। বিন্দু রক্ষা করিয়া চল। বিন্দু সাধনায় যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন। অর্থাৎ উর্দ্ধরেতা হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত যোগী এবং মানবদেহে দেবতা। ত্রিগুণাতীত সকলে হইতে পারেনা। তবে সত্ত্বগুণ যাহাতে বাড়ে সেই চেষ্টা সকলের করা দরকার। তিন জন্মে মুক্তি হয় যাহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াছে। আধার ভাল থাকিলে এবং গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাকিলে একজন্মেও মুক্তি হয়।

শিষ্যের ভক্তি বিশ্বাসের গুণেও অনেক গুরুর গুরুত্ব ফুটিয়া উঠে এবং উন্নতি হয়। রূপকথার কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিওনা। অনেক সত্য কাহিনী আছে। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল শিষ্যের গুণে। অথচ এই মীননাথ যোগীকুল গৌরব। লোকশিক্ষার জন্য ভগবান অনেক লীলা করাইয়াছেন মহাসিদ্ধদের মাধ্যমে।

"জগতে উপদেশের অভাব নাই। আমার কাছে নূতন কি আর শুনবে? পাঠশালায় পড়েছ নিশ্চয়ই সদা সত্যকথা বলিবে। কয়জনে পালন করে চলছ শুনি। সব উপদেশ হয়তো সকলের বেলা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তোমার যা প্রয়োজন, যা সম্ভব করে যাও। গৃহী ভক্তের জন্য প্রয়োজনবোধে যাহা বলা হয় সেটুকু মেনে চললেই যথেষ্ট। ত্যাগী, সন্ন্যাসীকে অনেক কঠোর, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়।" ভক্তদের প্রশ্নোত্তরকালে ঠাকুরের উক্তি।

তোমরা হয়তো শুনিয়াছ দুই বন্ধুর কথা। রোজ সন্ধ্যায় দুই বন্ধু একসঙ্গে বাহির হয় এবং একসঙ্গে ফিরিয়া আসে। একজন যায় কোন মন্দিরে পাঠ কীর্ত্তন শুনিবার উদ্দেশ্যে অপরজন যায় পতিতালয়ে। মন্দিরে রোজ পাঠ কীর্ত্তন শুনিয়াও মানসিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভাবে কিছু তো লাভ হইল না। তারচেয়ে বন্ধুটি পতিতালয়ে কিছুটা আনন্দলাভ করিতেছে বৈ-কি। অপর বন্ধু মনে মনে ভাবে, আমি রোজ নরকভোগ করিতেছি। কি ভাগ্যবান সে। উভয়ের নিত্যকার কর্ম্ম এবং চিন্তাভাবনা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিছুদিন পরে উভয়ে বাড়ী ফিরিবার পথে দুর্ঘটনায় একই সঙ্গে মারা

গেল। বিষ্ণুদূত আসিয়া পতিতালয়ে যে বন্ধু যাইত তাহাকে এবং যমদূত সৎসঙ্গীকে নিয়া গেল। তাৎপর্য্য কিছু বুঝলে? দণ্ডীস্বামীর অহংকার জন্মিল, তিনি মহাসিদ্ধ পুরুষ ব্রহ্মচারী, নারী তাহার কি করিতে পারে? ভগবান কিভাবে তাহাকে শাস্তি বিধান করিয়া শিক্ষা দিলেন হয়তো অনেকেই জাননা তোমরা। অহংকার, অভিমান, ধর্ম্মার্থীর পরমশত্রু।

দণ্ডীস্বামী রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন। ভীষণ তুফানে ব্যতিব্যস্ত হইয় সম্মুখে একখানা খড়ের কুটীরে আশ্রয় নিলেন রাত্রিবেলা। ভিতরে পরমাসুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন স্বয়ং নারায়ণ। রাত্রে স্বামীজীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। নারীসঙ্গের লালসায়। নারীমূর্ত্তি ঘরের দরজা খুলিতে নারাজ। উপদেশ দিল অনেক স্বামীকে। কিছুতেই কাজ হইল না। আজন্ম ব্রহ্মচারী স্বামীজীর মতিভ্রম হওয়াতে ঘরের চালা ভেদ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিলে নারায়ণ কৌশলে সেখানেই আটকাইয়া রাখিলেন। প্রভাতে চীৎকার শুনিয়া লোকজন আসিয়া তাহাকে নামাইয়া দিল এবং এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজী অকপটে দোষ স্বীকার করিলেন। লোকেরা শুনিয়া তো অবাক। এই পরিত্যাক্ত গৃহে নারী আসিল কোথা হইতে? পরে দেখা গেল কিছুই নাই সেখানে। দণ্ডীস্বামী বুঝিলেন নারায়ণের চক্রান্ত, শিক্ষা পাইয়া গেলেন।

শিষ্যের ভক্তি বিশ্বাসের ফলে গুরুর কিভাবে উন্নতি হয় এই বিষয়ে অনেক গল্প আছে। এক গোয়ালার গল্প বলি। বেচারা রোজ এক ঘটিতে করিয়া দুধ নিয়া আসে সাধুর আশ্রমে। পথে পড়ে বেশ বড় একটা নদী। দুধ আসিতে দেরী হয় বলিয়া নারায়ণের স্নানের দেরী হয় এবং সাধু গোয়ালাকে প্রায়ই ধমক দেন। করজোড়ে গোয়ালা জানায় খেয়ার নৌকার দেরী হইলেই আশ্রমে পৌঁছিতে দেরী হয়। একদিন সাধুর মুখদিয়া বাহির হইয়া গেল তুমি হরি হরি বলিয়াও তো নদী হাঁটিয়া পার হইতে পার, খেয়ার নৌকার কি দরকার? সরল মানুষ গোয়ালা সাধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া পরেরদিন ঠিকই হরি হরি উচ্চারণ করিতে করিতে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া আসিল। সাধু মন্ত্র দিয়াছেন - জীবন্ত সত্য এই হরিনাম মন্ত্র। আর কি চাই। কি ভক্তি কি বিশ্বাস গোয়ালার। রোজই সময়ের পূর্ব্বেই

দুধ লইয়া আশ্রমে পৌঁছায়। সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন আজকাল তো দেরী হয়না তোমার, আগে তুমি ইচ্ছা করিয়াই দেরী করিতে। আজ্ঞে না কর্ত্তা, এই উপায় তো আমাকে আপনিই দয়া করিয়া দিলেন। আপনার মুখে হরিনাম মন্ত্র শ্রবণ করার পর হইতে আমি পায়ে হাঁটিয়াই নদী পার হইয়া আসি। শুনিয়া সাধু আকাশ হইতে পড়িলেন। বলে কি এই বেটা? সত্যতা প্রমাণ পাইবার জন্য গোয়ালার সঙ্গে সাধু একদিন নদী পর্য্যন্ত গেলেন। সে সত্যই হরি হরি বলিয়া নদী অনায়াসে পার হইয়া গেল। শিষ্য গুরুকে বলিতে লাগিল, গুরুদেব আসুন। গুরু জলে নামিয়া ভয়ে ভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আর যাইতে পারিলেন না অবশেষে শিষ্য তাঁহাকে ধরিয়া পার করিল। শিষ্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু বলিতে বাধ্য হইলেন যে সে পার হইয়াছে তাহার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারা, গুরু হরিনাম করেন বটে, তবে নিজের তেমন ভক্তি বিশ্বাস নাই বলিয়া তিনি নদী পার হইতে পারিলেন না।

ছল চাতুরী করিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না। মানুষের চোখে ধূলা দেওয়া যায় তবে ভগবানের হাতে রেহাই নাই। নরতনু ভজনের মূল। দেবতারা মানবজন্ম বাঞ্ছা করেন। এই দুর্ল্লভ মানবজন্ম পাইয়া যদি ভগবৎ ভজনে না লাগিল তবে জীবনের সার্থকতা কোথায়? শুধু বিষয় ভোগের জন্যই এই জীবন নয়। গৃহীর জন্য উপদেশ আগে ভোগ, তারপরে যোগ। ঠাকুর মৌনীবাবা কিন্তু আরও সহজ সাধন দিলেন। ভোগের সাথে যোগক্রিয়া। ভক্তরা হাতে হাতে ফলও পাইয়া যাইতেছে। যুবক যুবতীদেরও নববিবাহিত দম্পতিকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহাদের ভোগের সাথে যোগক্রিয়াও হইয়া যাইবে। সার্থক প্রজনন হইবে। অচিরে সিদ্ধিলাভও হইবে। সাধন ভজন সকলের জন্য। শুধু সংসার ত্যাগীদের জন্যই নয়। সিদ্ধযোগী ঋষিরাও বিবাহিত ছিলেন। রাজর্ষি জনকাদির কথা অবশ্যই শুনিয়াছ। রামায়ণ মহাভারতের কথা আজকাল কে না জানে। তবুও মানুষ ভুল করে। শাস্ত্রে ঋষিবাক্যে অবজ্ঞা করে, অপব্যাখ্যা করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়া নিজের এবং সমাজের ক্ষতিসাধন করিতেছে। ঠাকুরের প্রেরণাতে লিখিত একখানা কবিতা—

— মনুষ্য ফল —

সংসার বৃক্ষে ধরে
কত শত ফল,
কতক অকালে ঝরে
ঝরিবে সকল।
যেগুলি পাকিয়া পড়ে
রহে দীর্ঘকাল
তাদের ও গ্রাস করে
ভয়ংকর কাল।
ফলের কিছু অংশ
লাগে দেবভোগে,
আর কিছু ধ্বংস হয়
বিষয় সম্ভোগে।
তারাই ধন্য যারা
লাগিছে পূজায়,
বাগানের শোভা তারা
প্রভুর কৃপায়।

॥নিয় ॥

সদ্‌গুরু সঙ্গে লোভ সামলাইতে না পারিয়া একা গেলাম কলিকাতায় ১৯৮০ ইংরাজীর জুন মাসে। ঠাকুর তখন বেলেঘাটায় শ্রীযুক্তা মলিনা বালা রাহার বাড়ীতে' উঠিলাম হরিদার ফ্ল্যাটে বিবেকানন্দ রোডে আশ্রমে। রোজই ট্রামে, বাসে যাতায়াত করি। একটু আধটু সেবার কাজ করি এবং আনন্দ লাভ করিয়া পেটভরা প্রসাদ খাইয়া ফিরিয়া আসি। রাহা পরিবার সকলেই উচ্চশিক্ষিত। বাবা ছিলেন এডভোকেট, মা (মলিনাবালা) হেড মিষ্ট্রেস, চারভাই ও বৌরা সকলেই দুই তিন বিষয়ে এম, এ। কেউ প্রফেসার, কেউ লেকচারার, প্রত্যেকের নিজস্ব বাড়ী থাকা সত্ত্বেও পুরাতন বাড়ীতে প্রায়ই মায়ের কাছে থাকিয়া সকলে আনন্দ করেন। একটা আদর্শ পরিবার, প্রত্যেকে খাঁটি গুরু ভক্ত।

বড় বৌ অর্চ্চনা রাহা ঠাকুরের মেজদির নামে নাম বলিয়া মেজদি। আমার ও মেজদি। বলাইদা ও অমিতদার সঙ্গে বেশভাব হইল। ঠাকুর প্রসঙ্গে আলোচনা করিতাম, গান কীর্তন করিতাম। ভক্তরা আসিতেন গুরুদর্শনে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেল।

সম্প্রতি রাহা পরিবারে একটা অঘটন ঘটিলে ও গুরুসেবায় কোন ত্রুটি হইতেছেনা। কাল অশৌচ থাকায় গুরুদেবের সঙ্গে এইবার থাকা সম্ভব হইল না। তবে রোজই যাতায়াত করি। তাঁহার লীলা দর্শন করিয়া উপদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দ লাভ করি। বলাই রাহার একমাত্র ছেলে ঠাকুরের অতি প্রিয়পাত্র ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবে। হঠাৎ পরপারের ডাক পড়িয়া গেল এবং গুরুপদে চিরবিশ্রাম লাভ করিল শ্রীগুরু সাক্ষাতে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ছেলে ও মহাপ্রভুর সাক্ষাতে শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করে এবং ভগবান বুদ্ধের কাছে বিধবার একমাত্র ছেলের পুনরজীবন লাভের প্রার্থনা ও বুদ্ধদেবের উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ে আমি রাহা পরিবারের চির-দুঃখী পিতামাতা ও স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করার ফলে তাহাদের মনে বেশ আনন্দের সঞ্চার হইল। কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

একদিন বিকালবেলা এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ৬ ফুটের উপরে লম্বা "জয়গুরু শ্রীগুরু প্রেমকল্প তরু" গান গাইতে ঠাকুরের সামনে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বসিলেন এবং জয়গুরু মহানাম করিতে করিতে আবার চলিয়া গেলেন। ঠাকুর সন্ন্যাসীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমরা ভক্তরা এইদৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবিভূত হইয়া গেলাম। কে এই সন্ন্যাসী? পরে জানিলাম স্বয়ং বিশ্বনাথ।

একদিন সকাল বেলা বলেন, "আমার গায়ে কিছু ভস্ম মাখাইয়া দে। ভস্মে ও স্নান করা হয়। এর অনেক উপকারিতা আছে"। "উপকারিতা যেমনই হউক আমাদের পক্ষে তো ভস্ম মাখিয়া থাকা সম্ভব নয়। যাই হউক ভস্ম মাখাইয়া দিলাম মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত। ভাবিলাম হাতখানা পবিত্র হইয়াছে, সুতরাং আমার কপালে, গালে, বুকে হাতখানা বুলাইয়া নিলাম। কি সর্ব্বনাশ করিলাম? সমস্ত শরীরে এমন জ্বালা শুরু

হইল প্রাণ যায় যায়। কাঁদিয়া ফেলিলাম যন্ত্রণায়। সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, "কি হল ভাই, কি হল"? ঘটনাটা বলিলাম, ঠাকুর শুনিয়া এক ধমক দিলেন, "আমার শক্তি ধারণ করার করার যোগ্যতা তোর আছে নাকি? সব কিছুতে বাড়াবাড়ি করতে নাই। এই নে গায়ে মাখিলে আর জ্বালা থাকবে না"। বলিয়া সেই একই জায়গা হইতে কিছু ভস্ম লইয়া আমার হাতে দিলেন। আমি সর্ব্বশরীরে খুশীর চোটে মাখাইয়া নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা দূর হইল। আমরা এর কারণ বুঝিলাম না। তঁহার শরীরে এই হাতে ভস্ম মাখাইয়া শুধু হাতখানা গায়ে বুলাইয়া এত কষ্ট পাইলাম। আবার সেই হাতেই ঠাকুরের দেওয়া ভস্ম মাখাইয়া কষ্ট নিরাময় হইয়া গেল। ঠাকুরের লীলা বুঝা শক্ত। পায়ে হাত দেওয়া নিষেধ। আবার কখনও বলিতেন "দেখ তো আমার পায়ে কি অথবা পায়ে ব্যাথা একটু টিপিয়া দে" একটু হাত বুলাইয়া দিলেই নাকি আরাম হইয়া যায়। আর প্রয়োজন নাই"। কখনও গামছা জলে ভিজাইয়া একটু গা মুছাইয়া দে বিছানা আসন ঝাড়িয়া দে কিংবা রৌদ্রে শুকাইয়া আবার পাতিয়া দে। পায়ে পাদুকা পরাইয়া দে। তামাক সাজাইয়া দে"। কখন ও খুশীর অন্ত নাই। মুহুর্তে ভাবান্তর।

"আমার আহুতি করতে দেরী হয়। রাত হয়ে যায় তোদের বড় কষ্ট। তোরা আহুতি দিয়ে প্রসাদ নিতে পারিস্। আমার অপেক্ষা করবি না। তোরা ছেলে মানুষ"। একদিন দুইদিন আহুতি দিয়া খাইয়া নিলাম। আরেকদিন কঠোর শাসন। "সবাই বলে গুরুসেবা করছি। কিসের গুরুসেবা। গুরুর আগে দিব্যি খেয়ে নেয়"।

একদিন আমি রাগ করিয়া আহুতি দিই নাই। সকাল বেলাও কিছু পেটে পড়ে নাই। সারাদিন উপবাস। একটার পর একটা হুকুম পালন করিয়া যাইতেছি। রাত ৮টা হইবে। ভোগ শেষ হইল। "কিরে তুই আজ কখন আহুতি দিলি"। আজ আহুতি দিই নাই। সারাদিন উপবাস। একটু ও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। "নে এখন প্রসাদ খা। পেট ভরিয়া খা" বলিয়া নিজের থালা দিয়া দিলেন। সারাদিন খাই নাই কিন্তু একটি বার ও ক্ষুধা বোধ হয় নাই। সদ্গুরু

সঙ্গের যে কি ফল, সাধারণে বুঝিতে পারে না। প্রত্যেক শাসনের পিছনে শিক্ষাদান। ইহাই অহেতুক গুরুকৃপা।

আমার দুই মেয়েকে দীক্ষা দিলেন। ছোট মেয়ের বয়স বোধ হয় তখন পাঁচ বৎসর। মেয়ের কি লাভ হইবে এই দীক্ষায়? বড় হইলে মন্ত্র আপনা আপনিই জাগিয়া উঠিবে। এখন দেখি তাই হইয়াছে। ছেলেকে মন্ত্র দিলেন না। "পৈতা হইলে দিব যদি বাঁচিয়া থাকি"। ৯ বৎসরে ছেলের পৈতা দিয়া আশ্রমে নিয়া গেলাম এবং তাহাকে দীক্ষা দিলেন।

ঠাকুর আমার তো একটা কু-অভ্যাস আছে। 'কি আর হবে? সিগারেট খাওয়া। কুম্ভক করবি"। সিগারেট খাওয়া শিখাইয়া দিলেন। যোগ ক্রিয়া ও একসঙ্গে হইয়া গেল ডাক্তার রাওকে এই ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বললেন, "প্রাণায়ামের ফলে হয়তো সিগারেটের ধোঁয়া তেমন ক্ষতিকারক নয়। আমাদের ডাক্তারী বিদ্যাদ্বারা যোগী পুরুষের ব্যাপার বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই"।

একদিন বেকেঘাটায় সকালবেলা আমার চা পানের ব্যবস্থা দিলেন নিজেই। ভাল ভাল খাবার তৈয়ার করাইয়া সঙ্গে এক সস্‌পেন চা আহুতি দিতে হলেন। মণিনা বালা রাহা এবং আমি ও তাঁহাকে আহুতি দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলাম? ঠাকুর বলিলেন, "না আজ সে আহুতি দেবে। নিজের আসন ছাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহার ধুনীতে আমাকে আহুতি দিতে বলিলেন। আমি আহুতি দিতেছি এমন সময় বলিয়া উঠিলেন, "আজ তুমি আমার গুরু হলে"। আহুতি শেষ হইলে আবার আদেশ "তুমি প্রসাদ গ্রহণ করে সকলকে প্রসাদ দাও। চায়ের প্রসাদ কাহাকে ও দিতে নাই। চা, জল ও দুধের প্রসাদ দিবে না"। সবাই তাকাইয়া রহিল, আর আমি এক সস্‌পেন চা গিলিয়া ফেলিলাম। সকলে বাকী প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

আমি বসিয়া ঠাকুরের ভজন গাহিতে লাগিলাম। রাহা গিন্নীদের খুব উৎসাহ ঠাকুরের ভজন কীর্ত্তনে। নূতন গান অনেক লিখিয়াছি। ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "তুই এখন চলে যা মানিকতলা। তারকের

বাড়ীতে। ওরা তোর জন্য অপেক্ষা করছে। আজ তোর ভিক্ষা ওখানে। আমাকে তো কেউ কিছু বলে নাই। "না বললে ও আমি জানি. ওরা তোকে খুঁজছে"। অগত্যা পৌছিলাম মানিকতলা। ট্রাম হইতে নামিয়া দেখি একদল আমার অপেক্ষা করিতেছে। একটু পরেই টেক্সি নিয়া বেলেঘাটা যাওয়ার কথা। তারকদার ছেলে জানাইল তাহারা সকাল হইতেই আমার খোঁজ করিতেছে ? পৌছিয়া দেখি উৎসবের আয়োজন। নিমন্ত্রিত আছে অনেক। কারণ কি ? ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত গোপেশ্বর শিবের ভোগ হইবে আজ আমার হাতে। ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ হইল এবং ঠাকুরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণিত হইল।

ধর্ম্মতলা দাস ষ্টুডিওএর মালিক শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য। গুরুছাড়া কিছু বুঝেন না। সাধনে খুবই উন্নতি করিয়াছেন। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি রামঠাকুরের ফটো উঠাতে পারো, ওঁকে প্রণাম করবে"। কালীদা বলেন, "আমি ফটো উঠাতে যাব কেন"? "সেরকমই তো দেখলাম" ঠাকুর বলেন। ঠিক পরের রবিবারে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাতিপুকুরে নিয়ে যাওয়া হইল। ফটো উঠাইয়া "রামঠাকুরকে" প্রণাম করিয়া আসিলেন গুরুর আদেশ মত। কালীদা বলেন, "আমার ঠাকুর মানুষ নন। নরদেহে ভগবান"। দোতালার একটা ঘরে ঠাকুরের যুগল ফটো সেই পালঙ্কে ও বিছানায় আজও পূজা করা হয়। নীচে কালীদার আসন।

গতযাত্রায় আমাকে কোথাও যাইতে দিলেন না। নিজের কাছে রাখিয়া অনেক কিছু শিক্ষা দিলেন। এইবার অন্যরূপ ব্যবহার। তীর্থ-দর্শন ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা, ধর্ম্মালোচনা, ভজন কীর্তনে যোগদান এইসব করাইলেন। একদিন আদেশ দিলেন, "আগামীকল্য হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া বেড়াইয়া আয়। প্রথমে যাবি আদ্যাপীঠ, তারপর আমার সিদ্ধিস্থান দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলা, পাঠবাড়ী গৌরাঙ্গ মঠ ও বালানন্দ মঠ"।

আগামী কল্যই কেন বলিলেন ? সেই দিনটা ঝুলন পূর্ণিমা। সর্ব্বত্র

লোকে লোকারণ্য। একটা রিক্সা করিয়া আমি এবং হরিদা আদ্যাপীঠের কাছাকাছি পৌঁছিয়া দেখি এক বিরাট মহিলার দল বাহির হইয়া আসিতেছে। তারমধ্যে একটা মেয়ে শ্যামবর্ণা খুব লম্বা চুল, মুখটা গোল আমারদিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। রিক্সা হইতে পড়িয়া যাইতেই হরিদা আটকাইয়া নিলেন। "কিরে কি হল"? 'ঐ মেয়েটি'। কোন মেয়ে, কোথায় মেয়ে দেখলি? ঐ যে? অদৃশ্য হইয়া গেল। শরীরে কম্প শুরু হইয়া গেল। আমি আর আমাতে নাই। মন্দিরে গেলাম মায়ের আরতি চলিতেছে। বসিতে পারিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম দক্ষিণেশ্বরে। "এই যে পঞ্চবটী তলা। এখানেই বাবা সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও এখানেই সিদ্ধিলাভ করেন"। হরিদা প্রণাম করিলেন। আমিও প্রণাম করিলাম কিন্তু আর উঠিতে পারিলাম না। হরিদা আমাকে উঠাইয়া নিয়া গেলেন গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গাজলে চোখ মুখ মাথা ধুইয়া সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটু সুস্থ হইলে গেলাম মা ভবতারিণীর মন্দিরে। সেখানে ও ভিড়ে সামনে যাওয়ার উপায় নাই মায়ের আরতি চলিতেছে। ভাবাবেশে মহিলাদের ভিড়ের মধ্যেই ঢুকিয়া একেবারে দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দুই চোখে ধারা বহিতেছে। শরীর কাঁপিতেছে এই অবস্থা দেখিয়া মেয়েরা বাধা দিল না। বরং সেই সময়কার আকর্ষণ ছিলাম আমি পেন্ট শার্টপরা এক মত্ত পুরুষ। সুযোগ বুঝিয়া হরিদা আমাকে টানিয়া নিয়া আসিলেন। দ্বাদশ শিব দর্শন করিয়া প্রায় উন্মত্তের মতো আসিলাম গৌরাঙ্গ মঠ পাঠবাড়ীতে।

গৌরাঙ্গ মঠে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া শরীর ঠিক হইয়া গেল। প্রধান মোহান্ত মধুসূদন দাস বাবাজীর কামরায় যাইয়া আলাপ পরিচয়ের পর কিছুক্ষণ বসিলাম। মৌনীবাবার নাতি ও শিষ্য শুনিয়া খুব খাতির করিলেন। বৈষ্ণবরা মৌনীবাবাকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান দিতেন। মাঝে মাঝে বৈষ্ণবরা যাইয়া ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইয়া সেই মহাভাব দর্শন করিয়া গৌরলীলা স্মরণ করিয়া ধন্য মনে করিতেন। ২৪ প্রহর কীর্ত্তনের ও ব্যবস্থা হইয়া গেল সেইদিন। যেহেতু মৌনীবাবার নির্দ্দেশ, সারা বৎসরের

প্রোগ্রাম দেখিয়া একটা বিশেষ দিন সাব্যস্ত করিয়া আমরা ফিরিলাম। বাবাজী আমাদের জন্য মহাপ্রভুর বিশেষ ভোগ প্রসাদ দিলেন যেহেতু আমরা আহুতি দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করি। মহাপ্রভুর হস্তলিপি ও পাদুকা স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়া গেলাম।

হরিদার ফ্ল্যাটে পৌঁছিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। অগণিত ভক্তরা সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ নিয়া গেলেন। ঠাকুরের অহেতুক কৃপাগুণে আজ সে অভিজ্ঞতা লাভ হইল, তাহা তো জীবনে কল্পনাও করিতে পারি নাই। তন্ত্রসাধনে শ্মশানে কিংবা পঞ্চমুণ্ডী আসনে কতরকমের কষ্ট স্বীকার করিয়া কত বিভীষিকা, ভয়, প্রলোভনের ধাক্কা সামলাইয়া তবে মায়ের দর্শন পাওয়া যায়। আমারবেলা কিছুই লাগিল না। এমন গুরুর মহিমা জন্ম জন্মান্তর গাহিয়া বেড়াইলেও যথার্থ প্রচার হইবে না। রাতটা বড় কষ্টে কাটাইলাম।

ভোরবেলায় স্নান করিয়া বেলেঘাটায় ঠাকুরের কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। চায়ের ব্যবস্থাও হইল। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত সেখানে গুরু দর্শনের জন্য পৌঁছিয়াছেন। সকলের সামনে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কাল হরিদাসের সঙ্গে কোথায় কোথায় গেলি, কি দেখলি বলতো একটু শুনি।" আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে এইসব ঘটনা বলিলে আমার দর্শনাদির ফল নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই চুপ করিয়া গেলাম। ঠাকুর বার বার শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সবাই আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "বলুন না দাদা কি কি দেখে এলেন?"

গুরুকে স্মরণ করিয়া মনে মনে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। সকলে শুনিয়া তো একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। বলিতে লাগিলেন, "দাদা, আপনার জীবন ধন্য হয়ে গেল। ঠাকুরের অসীম করুণা আপনার উপর।" আমি তো লজ্জায় ও ফলনষ্ট হওয়ার ভয়ে দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িলাম ঠাকুর আশ্বস্ত করিলেন, আমার নাতি এখনো বালক, কিছু বুঝেনা। ওরে ওসব দর্শনাদি তো কিছুই নয়। মাত্র শুরু। আরো কত কি হবে। ওসব মায়াজগতের খেলা। অনেক দূরে যেতে হবে। ওসবে মন দিতে নাই। সাকার-নিরাকারের খেলা, কতকিছু ভবিষ্যতে বুঝতে পারবি। রাণী

রাসমণির বাগান বাটীতে বেলগাছের তলায় একা বসে আছি। তিথি চতুর্দ্দশী কি পূর্ণিমা হবে। আলোয় আলোকিত। হঠাৎ সামনে এক বিরাট পুরুষ; লম্বা কমপক্ষে আট দশহাত হবে। তোরা হলে হার্টফেইল হয়ে যেত। রমেশ ঠাকুরের সাহস ছিল। বাবাকে প্রণাম করলে আশীর্ব্বাদ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর তারাপীঠে, কাশীতে, কামাখ্যায়, ভুবনেশ্বরীতে, পুরীতে বিমলা মা রমেশ ঠাকুরকে দর্শন দিয়াছেন। যেখানেই গেছি কেউ বঞ্চিত করেন নি। যোগীধারায় যেমন আদিনাথ মহাদেব থেকে শুরু করে গোরক্ষনাথ যোগী পরম্পরায় সচ্চিদানন্দ নাথ (রমেশ ঠাকুর) তেমনি বৈষ্ণবধারায় মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, গুরুনানক, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিশ্বেশ্বর গোস্বামী ও রমেশচন্দ্র।

একদিন বিকালের দিকে অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন বেলেঘাটায়। ঠাকুর যোগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছিলেন। যোগবলের চেয়ে বড় কিছু নাই। যোগের দ্বারা পরমায়ু বাড়ানো যায়। স্বরোদয় শাস্ত্র বিষয়েও বলিতেছিলেন। পয়সা খরচা না করিয়া যোগক্রিয়া দ্বারা কিভাবে রোগের চিকিৎসা হয়, শরীর রক্ষা করা যায়, শিষ্য ভক্তদের শিক্ষা দিতেন। যোগশক্তি বলে স্থূলদেহে আকাশে বিচরণ ক্ষমতা লাভ করা যায়। পরদেহে প্রবেশ অন্তর্দ্ধান ইত্যাদি নানাবিধ শক্তিলাভ হয় যোগীদের। এক ব্যক্তির সন্দেহ দূর করার জন্য সামান্য একটু ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। খুব জোরে একবার হুঁংকার দিয়া একটু প্রাণায়ামের মত ক্রিয়া করিতেই চোখের পলকে ৮২ বৎসরের বৃদ্ধের শরীর রকেটের মত চলিয়া গেল এবং পাশের ঘরের দেওয়ালে লাগিয়া পড়িয়া যায়। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল এবং বলাইদা, অমিতদা এবং আরেকজন ভক্ত ধরাধরি করিয়া আনিয়া আসনে বসাইলেন। আমরা তো কান্না শুরু করিয়া দিলাম। হাত, পা, শরীর মালিশ করিয়া দিলে সুস্থ বোধ করিলেন। আমি বার বার বলিতেছি এই কষ্টের জন্য দায়ী আমি। কেননা যোগের কথা আমি প্রথমে উত্থাপন করি। ঠাকুর বলিতেছেন, "নারে তোর কোন দোষ নাই। এখানে একজনের হঠযোগ, রাজযোগ সিদ্ধপুরুষের শক্তি সম্বন্ধেও যোগশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ অবিশ্বাস দূর করার জন্য একটু দেখাইয়া দিলাম। যোগীগুরু

নিগমানন্দ ও রমেশ ঠাকুরের শক্তি অনেক সাধু সন্ন্যাসী পরীক্ষা করিয়া বহুবার দেখিয়াছেন। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে কি এইসব দেখানো সম্ভব? এরা তো মারিয়া ফেলিতে চায়। গুরুকে বাঁচাইয়া চলিতে শিখ। যোগে সর্ব্বোত্তম অবস্থা লাভ হয়। কর্ম্মক্ষমতা, একাগ্রতা, ভক্তি ও বিশ্বাস থাকলে যোগ সিদ্ধি হয়। যোগীদের বিভূতি আপনা আপনি আসতে থাকে। যারা অল্পবুদ্ধি তারা কিছু শক্তিলাভ হলেই প্রতিষ্ঠার লোভে পড়ে নিজের সর্ব্বনাশ করে। লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনা। তাদের আবার সংসারে চক্কর কাটতে হয় জন্ম জন্মান্তরে।"

একবার এক তান্ত্রিকাচার্য্যের সঙ্গে পরিচয় হইল। প্রণাম করিলাম সাধু পুরুষকে। চেহারা ও কথাবার্ত্তায় ভালই লাগিল। অনেক তান্ত্রিকক্রিয়া বোধহয় কামাখ্যাতে গিয়া শিখিয়াছেন। গুরুগিরিও করেন। কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, তিনিও যোগক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছেন অনেক বৎসর। কিন্তু কোন ফল না পাইয়া আবার তন্ত্রে আসিয়াছেন। আমার সন্দেহ জাগিল তাহার কথায়। ঠাকুরকে জানাইলাম তান্ত্রিকাচার্য্যের কথা। তিনি শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। তারপর বলেন, "শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস না থাকিলে কোন মার্গেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। বোতল ও সিদ্ধি টানিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। তোর এত মাথাব্যথা কেন? যা নিজের কাজ কর্।"

সাধুসন্তের উপর মানুষের আস্থা কমিয়া গিয়াছে, ইহা স্বাভাবিক। অর্থের লোভে, প্রতিষ্ঠার লোভে কত পাষণ্ড সাধু সাজিয়া নিজের তথা মানুষের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আর্যকৃষ্টির, ঋষিদের তপস্যার ফল, সাধনলব্ধ দেবদুর্ল্লভ অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষপান করিতেছে এবং সত্যধর্ম্মের অবমাননা করিতেছে।

প্রকৃত সাধুর পরিচয় পাওয়া কঠিন। সাধুর কাছে যাইয়া তেমন লাভও নাই। সাধু কিছু উপদেশ দিবেন। উপদেশ পালন করিয়া লাভ হইবে কি লোকসান হইবে কে জানে? তারচেয়ে যেখানে গেলে বৈষয়িক সুখ, আনন্দলাভ হয়, সেখানেই লোকের ভিড়। কেউ জলপড়া দিয়া যেকোন রোগীর মন জয় করে। কেউ কবচ মাদুলী ইত্যাদি দিয়া অনেকক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিয়া অর্থ ও সম্মান লাভ করে। বিশেষ কোন

রোগের হয়তো কেউ চিকিৎসা শিখিয়াছে। প্রচারের দৌলতে ধন্বন্তরী কবিরাজ হইয়া যায়। প্রচার, অপপ্রচারের ফলে নানা ধরণের রোগী বা সমস্যায় জড়িত ব্যক্তিও কিছু সমাধানের আশায় সেখানে ভিড় জমায়। পয়সা খরচ করিয়া ফল না পাইলেও একটা তৃপ্তি এবং সে রোজগারের মহল বানাইয়াছে তাহার তো কোন ক্ষতি হইতেছেনা বরং ভিত মজবুত হইতেছে। অল্পবুদ্ধি, সহজ সরল মানুষ সহজলভ্য বৈষয়িক লাভটাকে বড় করিয়া দেখে। তবে আধুনিক শিক্ষিত মানুষের সত্যে অবিশ্বাস, নির্বুদ্ধিতা, অসত্য ও মিথ্যার আশ্রয়ে সুখলাভের প্রয়াস ইত্যাদি দেখিয়া ভাবী কালের সমাজ জীবনের বিপর্যয়ের চিত্রটি ফুটিয়া উঠে।

মানিকতলায় শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে ২৪ প্রহর কীর্ত্তন শুরু হইল ঠাকুরের নির্দ্দেশে। পাঠবাড়ী গৌরাঙ্গ মঠের বৈষ্ণবরা পরম নিষ্ঠার সহিত ভোগরাগ হইতে শুরু করিয়া কীর্ত্তনের সহায়তা করিলেন। ভক্তদের দুঃখ যে এত প্রার্থনা করা সত্বেও ঠাকুর কীর্ত্তন উৎসবে আসিলেন না। ঠাকুর তো সর্ব্বক্ষণই কীর্ত্তনের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এই জ্ঞান কাহারও ছিল না। স্থূলদেহের উপস্থিতিটাই সকলে দেখিতে চান।

আমার মনে আছে একবার আমাদের বাড়ীতে খুব সুন্দর কীর্ত্তন করিয়াছিলাম আমরা। পরে ঠাকুর আমাকে বলেন, 'তোমাদের বাড়ীর কীর্ত্তন শুনিলাম খুব ভাল হইয়াছিল"। আপনি শুনিতে পাইলেন এত দূর থাকিয়াও ? "আরে দূর কোথায় ? যেখানে কীর্ত্তন হয় সেখানেই তো থাকি"।

একবার অরুণাচল প্রদেশের কিমিনে থাকাকালীন শুভ-আবির্ভাব উৎসব করিলাম। আমি কোমরের ব্যথায় উঠানামা করিতে পারিলাম না সেইদিন। খুব কষ্টে গীতা পাঠ করিয়া কীর্ত্তন শুরু করিলাম। প্রচুর লোক হইয়াছিল। হঠাৎ নজর পড়িল ঠাকুরকে, বিদ্যুতের মত উধাও হইয়া গেলেন। কীর্ত্তনের আনন্দে আমার কোমরের ব্যথা ও নিরাময় হইয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া সকলকে প্রসাদ বিতরণও করিয়াছি। সকলে তো অবাক হইয়া গেলেন। ডাক্তার কে, কে, দাস ও কীর্ত্তনে উপস্থিত ছিলেন গুরুদেবের জয় দিলেন সকলে।

২৪ প্রহর কীর্ত্তন শেষ হইলে কয়েকজন ভক্ত সেইদিন বেলেঘাটা যাইয়া ঠাকুরকে কিছু ভোগ ও প্রণামী দিয়া আসিলেন। সকলের একই অভিযোগ সব সুন্দরভাবে হইয়াছে, কেবল ঠাকুর উপস্থিত থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। ঠাকুর এতক্ষণে বলিতে বাধ্য হইলেন, "কেন গো, কীর্ত্তনে আমি যাইনি বুঝি? কি সুন্দর কীর্ত্তন হচ্ছিল, আমি বেশ শুনছিলাম, কিন্তু তোমরা তো আমাকে তাড়িয়ে দিলে"। তার মানে? সাপ বলে একমহিলা চীৎকার করিয়া উঠিল তারকের দেওয়ালের উপর বেশ বড় একটা সাদা রং-এর সাপ ছিল কিনা বলতো? বেচারা সাপ আর কি করে, গা ঢাকা দিলে"।

ভক্তরা বাবার জয়গান করে ও মহিমা অনুভব করিয়া বার বার মাটিতে প্রণাম করিয়া সজল নয়নে বিদায় নিল এবং এই ঘটনা প্রচার হইয়া গেল। সকলেই প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবার জয় দিলেন। সকলের মনে এক প্রশ্ন বাবার আসল পরিচয় তবে কি? বাহিরে ভক্ত, ভিতরে ভগবান।

কয়েকদিন পরে ব্যস্ত হইয়া আবার চলিয়া গেলেন হাওড়া মনসুকা আশ্রমে। সেখানে একান্ত সেবক ও সেবিকা শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মান্না ও তাহার স্ত্রী শ্রীমতী মুক্তকেশী মান্না। মৃত্যুঞ্জয় মান্নার লক্ষ্মী লাভ, প্রচুর ধনসম্পত্তি, সমাজে খ্যাতি ও সম্মান সবই প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবার আশীর্ব্বাদ ও কৃপাগুণে। এই পরম সত্য স্বীকার করিয়া মৃত্যুঞ্জয়দা পরমশ্রদ্ধা ভাজন গুরুভক্ত রূপে পরিচিত হইলেন। মুক্তাদির সেবানিষ্ঠা বাৎসল্য প্রেমের দৃষ্টান্তকে হার মানায়। একমাত্র পুত্র নবকুমার ও মেয়েরা সকলেই ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিল। কি পবিত্র এদের জীবন। এইরূপ দীর্ঘকাল গুরুসেবা আর কেহই করেন নাই। শুধু কি গুরুসেবা? গুরু ভাই-বোন গেলেও সমান আদর ও শ্রদ্ধার সহিত সেবাযত্ন পাইয়া অবিভূত। এদের সঙ্গে তুলনা করার মত বৈষ্ণব চরিত্র খুজিয়া পাইনা।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মান্নার গ্রামের বাড়ী মনসুকাতে গেলাম। সেখানে তাহাদের জমিতেই ঠাকুর আশ্রম করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করেন।

দামোদর নদীর তীরে মনোরম জায়গা ঠিক দক্ষিণেশ্বরের অনুরূপ। সেখানে সন্ধ্যায় উপাসনা কীর্ত্তন করিলাম এবং গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। মনসুকায় অবস্থানকালে ঠাকুর গরীব গ্রামবাসীদের ঘরে যাইয়া অতি সামান্য বস্তু ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আহুতি দিতেন। ঘাস জমা করিয়া এবং মাটির হাড়িতে জল লইয়া রাস্তায় ও মাঠে নিজের হাতে গরুকে খাওয়াইতেন। গ্রামের রাস্তা জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতেন। বটগাছের গোড়ায় জল দিতেন। অনেক জায়গায় ও আশ্রমে বেলেরগাছ ও অন্যান্য গাছের চারা রোপন করিতেন। ব্রাহ্মণ, হাঁড়ি, মুচিতে ভেদ ছিলনা। নামমন্ত্র দিতেন যাহাকে তাঁহাকে। এই অযাচিত নামের মর্য্যাদা অনেকে রক্ষা করিতে পারে নাই। বিনা পয়সায় দীক্ষা, নিয়মকানুনের বালাই নাই, কেবল দমে দমে নাম জপ করবি। কেউ খুশী হইত, কেউ বা ভাবিত পাগলের কারবার। এক এক সময়ে এমন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, ফলে তাঁহার দ্বিতীয় নামকরণ হয় "পাগলাবাবা"।

এখন এইসব ভক্তদের কি দুঃখ "আমরা ঠাকুরকে চিনতে পারলাম না। তাঁর সেবা করতে পারলাম না।" ঠাকুর প্রতিষ্ঠার ভয়ে সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন এবং বেশীদিন এক জায়গায় থাকিতেন না। হঠাৎ পাগলামি করিয়া চলিয়া যাইতেন। চলিয়া যাওয়ার পর ভক্তরা বুঝিতে পারিত এই পাগলাবাবা সাধারণ পাগল নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়া খেলা করিতেন। নারিকেলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, মুক্তাদি তৈরী করিয়া দিতেন। এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া কিংবা কৃষকের ক্ষেতে যাইয়া একটি নাড়ু এদের খাওয়াইতেন।

নিজেও গোপালের লীলা করিয়াছেন অনেক জায়গায়। পাতিপুকুরে গোপালের মা ঠাকুরের মধ্যে গোপালের রূপ দর্শন করিয়া যখনই দেখা হইত ঠাকুরকে কোলে বসাইয়া সব নাড়ু খাওয়াইতেন। ঠাকুরের বয়স তখন ১৮ বৎসর। দক্ষিণেশ্বরে এক সিদ্ধাযোগিনী গোপালের ভোগ লাগাইয়া গান করিতেন এবং ঠাকুর নাচিয়া নাচিয়া যোগিনী মায়ের কাছে যাইয়া ক্ষীর, নাড়ু প্রভৃতি ভোগ গ্রহণ করিতেন।

মেজদিদি অর্চ্চনাদেবী যখন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পড়েন, ঠাকুর তখন সারাদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে কাটাইয়া সন্ধ্যায় দিদির কাছে যাইতেন। দিদি একদিন একটু কটুবাক্য বলাতে রাগ করিয়া চলিয়া যান। দিদি যাইয়া অনুনয়বিনয় করিয়াও ফিরাইতে পারিলেন না। ছোটভাই হইলেও তখন মহাসিদ্ধ পুরুষ। দিদির ব্যথা বুঝিয়া বলিলেন, "যাইতে পারি একশর্ত্তে যদি আমাকে পেট ভরিয়া দুধের সর খাওয়াতে পার।" কাশীতে দুধের সরের অভাব নাই দিদি ছোটভাইকে পেটভরা সর খাওয়াইয়া গোপালসেবা দেন। রমেশকে জগতের সেরা সিদ্ধপুরুষ-শিবজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন যদিও ছোটভাই।

॥ দশ ॥

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ আমাকে সাক্ষাতে এবং চিঠিতে অনুরোধ জানান, যেভাবেই হউক বাবাকে রাণীবাড়ীতে নিয়া আস। শেষ সময়ে আমরা তাঁহার সেবা করিব। আমি মৃত্যুঞ্জয়দা, হরিদা এবং বিশ্বনাথদার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ঠাকুরকে ১৯৮২ ইংরাজীতে রাণীবাড়ীতে আশ্রমে নিয়া আসার ব্যবস্থা করিলাম এবং নরলীলার পূর্ণ হুতি দিতে ঠাকুর রাণীবাড়ীতে আসেন।

ঠাকুর পরিবারের সকলেই সেবার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রামের অনেক ভক্তরাও সেবার কাজে সহায়তা করিতেন। এই সময়ে অন্তরঙ্গ শিষ্যা গুরুগত প্রাণা ব্রহ্মচারিণী শুক্লা (গুরুদাসী) নিত্যসেবার কাজে পরম নিষ্ঠার সহিত যোগদান করে। সংসারী মানুষের পক্ষে দীর্ঘকাল ঠাকুরের যথারীতি নিত্যসেবা চালাইয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। তাই ব্রহ্মচারিণী গুরুদাসীকেই শ্রীগুরু নির্দেশে বিশেষভাবে এই গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে লইতে হইল। ১৯৮৬ সালে ঠাকুর রামেশ্বর আশ্রম হইতে তাঁহার গুরুধাম আনন্দেশ্বর শিবালয়ে আসন স্থানান্তর করিলে গুরুদাসী একাই গুরুর সেবা কার্য্য চালাইয়া গেল একেবারে অন্তিমযাত্রা পর্য্যন্ত। ঠাকুর নিজের হাতে আহুতি দেওয়া এবং ক্রমশঃ সকল কর্ম্মই ছাড়িয়া দিলেন। ফলে গুরুদাসীকেই আহুতি দিয়া নিজের হাতে শিশু গোপালরূপী গুরুদেবকে খাওয়াইয়া দিতে হইত এবং গোপালের সকল রকমের সেবাকার্য্য নিজের

হাতেই করিতে হইত। কিছুদিন পরে দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জগন্নাথ সাজিয়া রহিলেন অন্তিমক্ষণ পর্য্যন্ত। গুরুপ্রিয়া গুরুদাসী বাৎসল্যভাবে যেরূপ নিষ্কাম গুরু জগন্নাথের সেবা শুশ্রূষা করিয়া গিয়াছে এবং সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এইরূপ গুরুসেবার দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি কোন গ্রন্থে দেখি নাই। গুরুদেবের সঙ্গে দাদু-নাতনী সহজ সম্বন্ধ থাকিলেও পরমার্থভাবে একাত্মতা লাভ ঘটিয়াছিল। এইরূপ গুরুভক্ত ও গুরুভক্তি জগতে দুর্লভ। সর্ব্ব দেবময় গুরুদেবের মধ্যে শিবশক্তি, রাধাগোবিন্দ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি রূপের লীলা দর্শন করিয়া অভ্যস্থা গুরুদাসীর পার্থিব পরমার্থ কোন বাসনাই আজ আর নাই। স্বপ্ন, জাগ্রত ও সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায় নিত্য লীলাময় গুরু জীবন্ত সত্য ও স্ব-প্রকাশ।

কলিকাতা ও বিভিন্ন জায়গা হইতে ভক্তরা প্রচুর কষ্ট স্বীকার করিয়া রাণীবাড়ীতে আসিতেন ঠাকুরের একটু সেবা করার জন্য নিজের হাতে। মৃত্যুঞ্জয়দা, হরিদা, মঞ্জু, বিশ্বনাথদা প্রভৃতি বহুবার আসিয়াছেন। অন্তিম সময়ের উৎসবে নবকুমার, রামকুমার ও মলয় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভক্তরা আসিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া যায়। আমি এবং আমার ভাই কুণী সুযোগ পাইলেই ঠাকুরের কাছে আসিতাম। কলিকাতার গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিয়া ঠাকুরের স্নেহ স্পর্শে আমরা যে দিব্য আনন্দ ভোগ করিতাম, দেবতারাও বোধহয় আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক হইতেন। ঠাকুরের স্নেহের অন্ত ছিলনা। আমাদের চিঠি না পাইলে বা দেরী হইলে চিঠি লিখাইয়া কুশল সংবাদ জানিয়া লইতেন। ছুটি শেষ হইলে যখন বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতাম, তখন মাথুরের অবস্থা হইত আমাদের।

একবার বেশ মজা হইল। ভক্তদের অনেক চিঠি জমা হইল। ঠাকুর নিজের হাতে চিঠি লিখিতেন না বা পড়িতেন না। সেবক-সেবিকা কেউ চিঠি লিখিত এবং পড়িয়া শুনাইত। আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন চিঠিগুলি পড়িয়া জবাব দে। অনেকে অনেক ব্যাপারে উপদেশ বা আদেশ বা কোন সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া চিঠি দিয়াছে। ঠাকুরকেই সমাধান দিতে হইবে। আমাকে বলেন—, "বুদ্ধি করিয়া জবাব দিয়া দে। আমি আর কি বলিব?" জবাব লিখিয়া এক দুইখানা পড়িয়া শুনাইলাম। বলেন,

"ঠিক হইয়াছে জবাব"।

দুর্গাপুরের এক ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীর অপারেশন হইবে পেটে। খারাপ অবস্থা। জবাব দিলাম, "অপারেশনের প্রয়োজন নাই। পথ্য চালিয়ে যাও। ইষ্টমন্ত্রে আহুতি দিয়ে রোগিনীকে প্রসাদ দেবে। গুরুমন্ত্র জপ, সন্ধ্যায় উপাসনা, ঠিক হয়ে যাবে।" কিছুদিন পরে জবাব আসিল রোগিনী ভাল আছে। এই যে জবাব দিতাম খুশীমত ইহাতে ঠাকুরের মাহাত্ম্য নেপথ্যে কাজ করিত। যাহা উচিত জবাব ভিতরে বসিয়া তিনিই লিখাইতেন। এই সত্য উপলব্ধি করার জন্যই এই অভিনয়।

সংগীত শিল্পী এক যক্ষ্মা রোগীর বাঁচার আশা নাই। রোগীর স্ত্রী আশ্রমে যাইয়া ঠাকুরের চরণে পড়িয়া কান্নাকাটি করিত। দয়া পরবশ হইয়া একদিন ঠাকুর নিজের পাদুকা নিয়া যাইতে বলিলেন। রোজ চরণামৃত খাওয়াবে রোগীকে। আর কি চাই। কিছুদিন পরে রোগী সুস্থ হইয়া আবার ছাত্রদের গান শিখাইতে শুরু করে যেহেতু রোগীর গলাই রোজগারের সম্বল।

ইম্ফল মেডিকেল কলেজে ১৯৭৪ ইংরাজীতে আমার পেটে অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ মনে হইল একবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে কেমন হয়? বিশ্বনাথদাকে চিঠি লিখিলাম এবং জবাব আসিল অপারেশন লাগিবে না ওষুধেই সারিয়া যাইবে। তাহাই হইল।

৫ই এপ্রিল ১৯৮৮ ইংরাজীতে ডিমাপুর হইতে জীপে কোহিমা যাওয়ার পথে একটা বড়ট্রাকের সঙ্গে সামনা সামনি ধাক্কা লাগার ফলে ড্রাইভারসহ আমরা পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে আমার ও একজন যাত্রীর অবস্থা ঘোরতর ছিল। মাথায়, ডান হাঁটুতে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চোট লাগে। কোন রকমে বাঁচিয়া গেলাম। অন্য ঘোরতর আহত যাত্রীটি ও মনে হইল সুস্থ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছুটি নিয়া দেশে যাইয়া মারা যায়। আমি ও প্রায় ৭ মাস পরে সুস্থ হইলে ও হাঁটুর যন্ত্রণা বোধহয় জীবন ভর থাকিবে। মৃত্যুর হাত হইতে ঠাকুর কিভাবে রক্ষা করিলেন, ভাবিলে শিহরণ জাগে।

বিশ্বনাথ সেনের স্ত্রী ১৯৫৮ সালে মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। মারা

গেছেন খবর পাইয়া জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীরা অন্তিম সংস্কারের জন্য আসিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলেন রোগিনী মারা গিয়াছে। সকলে ও তাই দেখিলেন। এই মৃতার মধ্যে আবার প্রাণ সঞ্চার কি করিয়া হইল? ঠাকুর দিনরাত অখণ্ড যজ্ঞ করিতেছেন। হঠাৎ মধ্যরাত্রে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে একটু খবর নিয়ে আয়, বিশ্বনাথের স্ত্রী বুঝি বেঁচে নেই"। টেক্সি করিয়া সবাই যখন সীমলাষ্ট্রিটে পৌঁছিলেন, তখন প্রতিবেশীরা বলাবলি করিয়া যে যার বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছে। ভক্তরা গিয়া জানাইলেন যে ঠাকুর পাঠাইয়াছেন তাহাদের খবর নিয়া যাওয়ার জন্যে তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে বাবা কৃপা করিয়া ভক্তের অকাল মৃত্যু রোধ করিলেন সকলে মৌনীবাবার জয়দিল। সেই মহিলা শ্রীমতী প্রতিমা সেন, পরম ভক্তিমতী এখনও বাঁচিয়া আছেন।

বিশ্বনাথের ছোটভাই নীলরতন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিতেছেন। শিয়রে ঠাকুরের ফটো গীতা রাখা হইয়াছে। পরিবারের সদস্যরা কেউ ইষ্টনাম জপ করিতেছেন, কেউ ঠাকুরের কাছে কাঁদিতেছেন, কেউ হরে কৃষ্ণ নাম করিতেছেন, কেউ গীতাপাঠ করিতেছেন যাহাতে মৃতের সদ্গতি হয়। ডাক্তার সময় দিয়াছেন রাত ১২টার মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে। রোগী এখনও জীবিত এবং ভোরবেলা চোখ খুলিল। সকলতো আনন্দে আত্মহারা। ডাক্তারও অবাক। জগতে অলৌকিক শক্তি আছে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। রোগীর বর্ণনামতে এক কালপুরুষ নিয়া যাওয়ার জন্য ঘরে প্রবেশ করিলে ঠাকুর প্রকাশিত হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ঠাকুর আবার শিয়রে রাখা ফটোতে মিলাইয়া গেলেন।

হাওড়া মনসুকাতে জীবন কৃষ্ণ পাঁজার পুত্র ধীরু সর্পাঘাতে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আজও বাঁচিয়া আছে। ওঝার মন্ত্র, ডাক্তাররা সববিফল হইলে ঠাকুর মৌনীবাবার কাছে লোক গেল। তিনি আসিয়া রোগীকে দেখিলেন এবং হুংকার দিতে দিতে সমস্ত বিষ নিজের শরীরে টানিয়া লইয়া রোগীকে বাঁচাইয়া দিলেন। তাঁহার সোনার অঙ্গ নীল

হইয়া গেল। প্রায় এক সপ্তাহ শারিরীক কষ্ট ভোগ করিয়া সুস্থ হইলেন। গ্রামের লোক ও ভক্তরা সাধুর মহিমা দেখিয়া মন্তব্য করিল, "ইনি স্বয়ং শিব"। দৈবশক্তি ছাড়া রোগীর বাঁচিবার আশা ছিল না।

তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার আরও একটি প্রমাণ আমার পিতার মৃত্যু। হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে আমার মাকে বলেন, "তোর ৫৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়া যাইবে। নারে তুই বাঁচবি আরও কিছুদিন। তবে জামাই চলিয়া যাইবে"। ঠিক সেই সময়েই মার মৃত্যু হওয়ার কথা. কিন্তু বাবা দুপুরে জ্বর উঠিয়া সন্ধ্যাবেলা নারায়ণের নাম করিতে করিতে গুরুধামে চলিয়া গেলেন।

১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে আমার ছোট ভাই কুশীর ছোট মেয়ে মুক্তি আমাদের সঙ্গে ঠাকুর দর্শনে যাইয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শরীর একেবারে ঠাণ্ডা। কান্নাকাটি শুরু হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রী শিশুকন্যাকে ঠাকুরের সামনে রাখিয়া ভাই কুশীও চোখের জল ফেলিতেছে। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে দুই বৎসরের মেয়ে মাকে হারাইয়াছে আজ ঠাকুরের সামনেই বিদায় নিতেছে। বাবা সহ্য করিবে কিভাবে এই ধাক্কা। মেয়েটি গুরুর চরণেই ঠাঁই পাইবে এই আনন্দে আমার ভাই নির্ব্বিকার যদিও চোখে জল।

ঠাকুর বারবার বলিতেছেন, "ওরে ও কেতকী কুশীর মেয়েটা মারা যাইতেছে। তোর বায়োকেমিক ঔষধ দিয়া একবার চেষ্টা কর"। শরীরে প্রাণ নাই। ঔষধ দিয়া কি হইবে"? একবার চেষ্টা করতে আপত্তি কি"? চিন্তা ভাবনা করিয়া ঠাকুরের নাম নিয়া কয়েকটা পিল চামচে জলের সঙ্গে মিলাইয়া মুখে দিলাম এবং নাড়াচাড়া করিয়া দিলাম যাহাতে জল উদরে পৌঁছিতে পারে। একঘণ্টার মধ্যে মেয়েটি সুস্থ হইয় উঠিল এবং বাড়ীতে যাইতে চাহিল। ঠাকুরের মহিমা সকলের সামনে প্রচারিত হইল।

একবার হৃষিকেশে সাধুবেশধারী কিছু দুষ্ট ঠাকুরকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখে এবং প্রাণনাশের চেষ্টা করে। ঠাকুর বুঝিতে পারিয়া ঘর হইতে অন্তর্ধান হইলেন। বিশ্বনাথদা প্রমুখ কিছু ভক্ত ঋষি-

কেশে গিয়া ঠাকুরের অন্তর্ধানের খবর পাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং পরে জানিতে পারেন ঠাকুর বেহালাতে আছেন।

সাধুকে পরীক্ষা ও জব্দ করিবার জন্য দুর্বৃত্তরা মেয়েলোকের সাহায্য নিয়া দেখিল ঠাকুর নপুংসক নন। উর্দ্ধরেতা মহাযোগীর পরিচয় পাইয়া সম্মান জানাইল। কত জায়গাতে গাঁজা, ভাং খাওয়াইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়াছে। একবার এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে কিছু দুর্বৃত্ত ঠাকুরকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সেখানে পুষ্কর লাগিয়া বাড়ীর কেহই জীবিত নাই এবং এখন ভূতের আড্ডা। ভয়ে কেহ সেইদিকে যায়না। দুর্বৃত্তরা সঙ্গে নিয়া যায় চার বোতল দেশীমদ। ঠাকুরকে প্রথমে এক বোতল পান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন ইহাদের কুমতলব। নিজেকে সামলাইয়া নিয়া এক এক করিয়া চার বোতল মদ পান করিলেন জলের মত। বলেন "তৃপ্তি হয় নাই; আর থাকিলে দাও। অনেকদিন পরে তোমরা ভাল জিনিষ দিয়াছ।" বেটারা সাধুর ক্ষমতা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। ঠাকুর ভাবিলেন, রাতটা এখানেই কাটাইয়া ভোরে চলিয়া যাইবেন। রাত্রে উৎপাত শুরু হইল। অগত্যা ভূতের দল অন্যত্র চলিয়া গেল। শয়তানরা ভোরবেলা দল বাঁধিয়া আসে সাধু জীবিত না মৃত দেখার জন্য। সাধু তো আনন্দেই আছেন। তাহারা রাত্রের ঘটনা শুনিয়া সাধুর জয়গান করিয়া উঠিল এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

হাওড়ার প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মণ্ডল ঠাকুরের একজন প্রিয়ভক্ত। ষোলমাস তাঁহারা ঠাকুরের সেবা করেন এবং আজও কৃতজ্ঞচিত্তে ঠাকুরের গুণগান করেন। রামকৃষ্ণদার বাড়ীতে কোন অভাব নাই। তবুও দীনদুঃখীদের ঘরে যাইয়া ঠাকুর তাহাদের দুঃখ কাহিনী শুনিতেন এবং সামান্য ভিক্ষা করিয়া নিয়া আসিতেন। রাজার গুরু ভিখারীর বাড়ীতে গেলে রাজার মনে দুঃখ হয়, লজ্জাবোধ হয়। এখানেও তাই। ঠাকুরের তো কোন লজ্জা নাই, মান অপমানবোধ নাই। দয়া আছে মায়া মোহ নাই। রামকৃষ্ণদা "বাবা যখন আমাদের কাছে ছিলেন, মনে হইত কত আপনজন। তিনিও আমাদের ছাড়া কিছু বুঝেন না। কিন্তু যেদিন চলিয়া গেলেন, একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। যেন কিছুই হয় নাই তাঁহার।

অথচ আমাদের পরিবারে নামিয়াছে শোকের ছায়া ”

১৯৮৫ ইংরাজীতে রামকৃষ্ণদার স্পণ্ডেলাইটিস্ হইয়া হাত উপরে উঠাইতে পারেন না। জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল রোগ যন্ত্রণায়। গেলেন ঠাকুরের কাছে রাণীবাড়ী আশ্রমে। ঠাকুর শুনিয়া তিনবার হুঁংকার দিলেন তাঁহার হাতখানা নিজের হাতে লইয়া। রোজই জিজ্ঞাসা করেন, "কিরে তোর হাতের ব্যথা কমেছে ?" "কিছু কম বোধ হচ্ছে বাবা।" তৃতীয়দিনে সম্পূর্ণ নিরাময়। আজ ১০ বৎসর যাবৎ কোন কষ্ট নাই। ঠাকুর স্থূলদেহে নাই, যেন কেহ ভাবিতে পারেন না। সহ্য হয় না এই বিরহ। কবে প্রাণনাথের সঙ্গে আবার মিলন হইবে, তাঁহার চরণসেবার সুযোগ হইবে অন্তরঙ্গ ভক্তদের একই প্রার্থনা, জীবন সাধনা।

ঠাকুরের মহিমার অন্ত নাই। তিনি যেমন বলিতেন, অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্তিম সময়ে স্বয়ং গুরু আসিয়া নিয়া যান, এর জ্বলন্ত উদাহরণ পাইলেন তারকদার চিঠিতে। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন পরম ভক্তিমতী ও গুরুগোপেশ্বরের একান্ত সেবিকা। পরপারের ডাক আসিল। পতি, পুত্র, সোনার সংসার সাজাইয়া দিয়া সতী বিদায় নিলেন; স্বজ্ঞানে হাত উঠাইয়া গুরুকে প্রণাম জানাইয়া। সকলেই বিশ্বাস করিলেন চোখের সামনে দেখিলেন, "হাসিমুখে সামনে কাহাকেও প্রণাম জানাইয়া সতীদেহ ত্যাগ করিলেন।" ঠাকুরের কাছে গেলে একদিন বলিলেন, "তারকের স্ত্রী বড় ভক্তিমতী ছিল। এখন আমার কাছেই আছে। আরও অনেকেই আছে আমার কাছে।"

শুধু গুরুকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে আর কিছু না করিলেও চলে। সকলের বিশ্বাস নাই মানুষ গুরুতে। মুখে তো ভক্তি দেখায়। নির্ভরতা সকলের নাই। গুরুধামই নিত্যধাম। গুরুনিষ্ঠ ভক্ত গুরুর কাছেই যায়। গুরুর যে গতি, শিষ্যেরও সেই গতি হয়। গীতায় কি বলা হইয়াছে ? "সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এর মানে কি ? মানুষ স্বভাব অনুযায়ী চলে, কর্ম্ম করে ও ফল ভোগ করে। ইষ্টগুরুতে অভেদজ্ঞান, গুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভর করাই বিধেয়। মানুষ আত্মচেষ্টায় অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু মুক্তি— সর্ব্বাভীষ্ট লাভ একমাত্র গুরুকৃপাতে; গুরুর ইচ্ছাতেই হয়। গুরু পথাবলম্বী শিষ্যদের ভিতরে গুরুশক্তি ক্রিয়া করিয়া

যাইতেছে। নির্ভরশীল শিষ্যের অতি চেষ্টা বা শ্রমসাধ্য কিছু করার দরকার নাই। যখন যাহা প্রয়োজন, গুরুশক্তি করাইয়া নিবে।

এক পাঞ্জাবী সুবেদার সুমিত্র সিং রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের বিরাট ভক্ত। আমার ঘরে ঢুকিয়া "ওয়াহী গুরু" বলিয়া জোড়হাতে প্রার্থনা জানাইতেন, প্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং বলিতেন, "ইনি শুধু আপনার গুরুই নন্, জগদ্‌গুরু আমি প্রমাণ পাইয়াছি"। মোম, আগরবাতির জন্য একখানা দশটাকার নোট রাখিতেন ঠাকুরের আসনে। মানা করিলে বিরক্ত হইতেন।

উত্তর প্রদেশের লোক চেরাগী সিং আমার কাজে সাহায্য করিত। কর্মোপলক্ষে আমি আগরতলায় গেলাম। ঠাকুর রাত্রে চেরাগী সিংহকে স্বপ্নে বলিলেন, "তুমি একটা মোম ও একটা আগরবাতি জ্বালাইয়া সন্ধ্যার সময় আমাকে দেখাইবে রোজ তোমার সাহেব ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত। মোম মাটিতে রাখিবে নইলে ঘরে আগুন লাগিয়া যাইতে পারে"। আমি ফিরিয়া আসিলে চেরাগী সিং এই ঘটনা আমাকে জানাইল। আমি মাটিতে আসন পাতিয়া জপধ্যান করি সে দেখে। তাই কাঠের একখানা বড় পিঁড়ি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে যাহাতে আমার পূজায় অসুবিধা না হয়। ঠাকুরের ভক্ত হইয়া গেল।

গাড়োয়াল প্রদেশের লোক ভগবান সিং ঠাকুরের চরণে আশ্রয় লইল। ঠাকুর নানাভাবে জন সমাজের প্রভূত সেবা করিয়া গিয়াছেন।

গুরুর শাসন ও বড় মজার এবং শিক্ষাপ্রদ। একদিন বলেন, "আজকাল সংসারে বড় অনাচার চলছে। দেখলাম এক বেটা বিছানার বেটীর পায়ের দিকে মাথা দিয়া শুইয়া আছে। এইসব উচিত নয়। স্ত্রীকে সকল স্বামীই ভালবাসেন। ভালবাসার অর্থ অনাচার নয়"। এই বেটা কিন্তু ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য পরম গুরুভক্ত, একনিষ্ঠ সেবক, ভক্তি-মার্গের এক মহাজন পরম বৈষ্ণব শ্রীমান কুশীরঞ্জন আমার ছোট ভাই। কুশী সেই সময় উপস্থিত ছিল। সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিল সকলের সামনে। সকলের শিক্ষা হইয়াগেল।

এক পরমভক্তের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহার সেবা গ্রহণ তো দূরের কথা, দর্শনের অনুমতিও দিলনা কিছুদিন। অবশেষে আমি ক্ষমা চাহিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলাম। কিন্তু ভক্ত দণ্ড পাইয়াও খুশী। যিনি দণ্ডকে আশীর্ব্বাদ বা কৃপা বলিয়া গ্রহণে সমর্থ এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা গুরুর মন জয় করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ ভক্ত। সেই ভক্তটি আমাদের শ্রীনিরঞ্জন ব্রহ্মচারী। বর্তমানে পুরীতে আছেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী, আলস্যহীন একনিষ্ঠ সেবক।

গুরুর কাছে সকলেই ধন, রোগারোগ্য এবং বৈষয়িক সুখ চায়। যাহারা কোন কিছু চায় না তাহারা কিন্তু অনেক বেশী পায়। গরীব, দুঃখী, সমাজে যাহারা অবহেলিত, ভগবানের দৃষ্টি তাহাদের উপর বেশীই থাকে। এর একটা প্রমাণ দিলেন ঠাকুর। আমাকে সঙ্গে লইয়া অনেক গরীবের বাড়ীতে ভিক্ষা করিয়াছেন এরা গরীব মানুষ, মা থাকিলে অল্প বলিয়া দিতে সংকোচ। তাই চাহিয়া নিলেন কাহারো বাগান হইতে কয়েকটা কাঁচালঙ্কা, একটা ঝিঙ্গা, একটা বেগুন, একটা আলু, এক বাড়ী হইতে এক চামচ চা-পাতা ও দুই চামচ চিনি আজ যে মহাপ্রভুর ভোগে লাগিবে। সেইসব বাড়ীতে আজ অন্নকষ্ট নাই। অনেক বাড়ীতে পাকা-ঘর হইয়াছে দেখিলাম। প্রভুর কি দয়া, তবেই তো দীনবন্ধু

আমার দিদি শ্রীযুক্তা যোগমায়া গোস্বামীকে ঠাকুর খুব স্নেহ করিতেন। একদিন ঘরে কিছুই নাই যে গিরিধারীর ভোগ দিয়া বাচ্চাদের মুখে দিতেন একটু। লীলাময় জগদ্গুরু পৌঁছিলেন নাতনীর বাড়ীতে এবং শুনিলেন আজ ঘরে কিছুই নাই। একটা থলি লইয়া গ্রামে ভিক্ষায় বাহির হইলেন এবং অনেক কিছু নিয়া আসিলেন। "নাতনী দেখ কত কিছু আনিয়াছি। রান্না কর, আমিও আহুতি দিব" বলিয়া বসিলেন। দিদির আনন্দের সীমা নাই। আহুতি দিয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদেরে প্রসাদ দিলেন। জগন্নাথ ভক্তের জন্য ভিক্ষা করিলেন।

গীতায় আছে —

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

ভগবান ভক্তের বোঝা বহন করেন। এমন বহু সত্য কাহিনী আছে। আমাদের ঠাকুর দেশে বিদেশে বহু মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছেন। দিদির অভাবের সংসারেও সমৃদ্ধি আসিল মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই এবং আজ বাড়ীতে পাকাঘর, ঠাকুরঘর সবই হইয়াছে এবং স্বয়ং ঠাকুরও দেখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কাছে গিরিধারী ও গুরু অভিন্ন বলিয়াই উন্নতি হইয়াছে।

আমার দাদা গুরুভক্ত হইলেও মনে দুঃখ ছিল তাঁহার কিছুই হইল না। গুরুবাক্যে ভরসা করিয়া চলেন এতকাল আজ দালানে বাস করিতেছেন। পুর্ণজন্ম ও লাভ করিয়াছেন।

ঠাকুর একবার রাণীবাড়ীতেই ভিক্ষা করিয়া উদয়াস্ত কীর্তন করার নির্দ্দেশ দেন আমাকে ও আমার ভাই কৃশীকে। আমরা তো বিপদে পড়িলাম। উৎসবের ব্যয় আমরা বহন করিব বলাতে রাগিয়া গেলেন। ভাল চাকুরী করি। যখন উদ্বাস্তু ছিলাম তখন ভিক্ষা করি নাই। আর আজ ভিক্ষা করিতে হইবে যেন অসম্মান বোধ হইল। গুরুর আদেশ অমান্য করিতে সাহস নাই আমাদের। প্রথম এক দুই ঘরে ভিক্ষা চাহিতে গিয়া লজ্জা বোধ হইলেও সহজ হইয়া গেলাম। প্রচুর ভিক্ষা করিলাম। উৎসবে খরচ হওয়ার পরে যাহা বাঁচিয়া গেল গরীব দুঃখী-দের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলাম ঠাকুর খুব খুশী হইয়া বলিলেন, "মহাপ্রভুর উৎসবে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, মুচী সকলেই অন্ন গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। ভবিষ্যতে আমার অবর্তমানে যখনই উৎসব করিবে সকলকে নিয়াই করিবে। সকলেই ফললাভ করিবে অর্থাৎ কৃপালাভ করিবে। সকলকে নিয়াই ভগবানের মনুষ্য সমাজ। জানিয়া রাখ, তোমাদের উৎসবে শুধু মানুষই উপকৃত হয় না, কুকুর, গরু, কাক, পিপী-লিকা প্রভৃতিও ধন্য হইয়া যায়"। জগদ্গুরুর লীলা এবং প্রত্যেকটি কর্ম্ম জীবজগতের কল্যাণের জন্য।

আমার স্ত্রীকে একবার স্বপ্নে বলেন, "কিরে আমাকে এইবার পাকা আম খাওয়ালি না যে? একটু পাকা আম খাওয়াবি, কেমন? সকাল বেলা স্বপ্নবিবরণ শুনিয়া পাকা আম, সন্দেশ, লাড্ডু ইত্যাদি নিয়া

আসিলাম এবং সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ভোগ দিয়া সকলকে প্রসাদ দিলাম। সেই আম ঠাকুরের কাছে কিভাবে মহাপ্রভু পৌঁছাইয়া দিলেন শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। ঠাকুর আহুতি দিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ঘরে ঢুকিয়া দেখেন ধূনীর নিকটে ৪টা পাকা আম। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন লোক তো এখন আসে নাই, তবে এই আম কোথা হইতে আসিল? জবাব দিলেন, "তুমি বুঝবে না, মহাপ্রভু দিয়া গেলেন। কাটিয়া দাও, আহুতি দিয়া আমি গ্রহণ করব। তোমরাও প্রসাদ পাইবে"।

ঠাকুরের আসন রহিয়াছে হরিদার ফ্ল্যাটে, বিবেকানন্দ রোডে, তিনতলায়। দমদমে কর্ম্মরত গুরুভাই সুধীরদা সীমলাষ্ট্রিটে বিশ্বনাথদার বাড়ীতে যাওয়ার সময় দেখেন আশ্রমের বারান্দায় এক শ্যামবর্ণা যুবতী দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছে। বিশ্বনাথদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওখানে কারা এসেছে"? "কই, না তো কেউ আসেনি। আসবেই বা কি করে? তালাবন্ধ ঘর চাবি আমার কাছে"। সকলেই অবাক, গুরুর লীলা আর কি?

গুরুদেব ফ্ল্যাটে থাকাকালীন একটা ঘরে বিশ্বনাথদা রাত্রে থাকিতেন এবং ঠাকুরের সেবা করিতেন। একরাত্রে ঠাকুরের ঘরের দরজার ফাঁক-দিয়া খুব আলোর জ্যোতি বাহির হইতেছে দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। চুপচাপ দরজার কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখেন এক বিরাট দিব্য জ্যোতি ঠাকুরের মাথার উপর ঘুরিতেছে। দেখামাত্র অজ্ঞান হইয়া বারান্দায় পড়িয়া গেলেন। ভোরবেলা ঠাকুর বাথরোমে যাওয়ার জন্যে দরজা খুলিয়া দেখেন বিশ্বনাথদা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কি করছিলে"? জবাব দিলেন, "বাবা বড় অন্যায় করে ফেলেছি বলে সাজা পেলাম সারারাত। আপনার কৃপায় বেঁচে গেলাম। তবে বাবা যা দেখলাম ওসব কি"? যা সত্যি তাই দেখেছিস্। আর কোনদিন এরূপ করবি না। আমার কাছে কত দেবদেবী, যোগী ঋষিরা আসেন। লুকিয়ে দেখার আর চেষ্টা করবি না। "এবার বেঁচে গেলি, "বলিয়া বিশ্বনাথদাকে উঠাইলেন।

বিশ্বনাথদা পরম ভাগ্যবান। ঠাকুরের দয়ায় বহুবার হিমালয় পরিক্রমা,

গঙ্গোত্রী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যান্ত ভ্রমণ করিয়া বহুপ্রকার দর্শন, সাধুসঙ্গ ইত্যাদি করিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেন, "ওযে আমার হনুমান।" এই বৃদ্ধ বয়সেও ঠাকুরের যাহাতে প্রচার, প্রতিষ্ঠা হয়, ভক্তদের মধ্যে যোগাযোগ হয়, সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং ভাল আশ্রম করিয়া সকল ভক্তদের অভাব পূরণ হয় এই প্রয়াস অব্যাহত রাখিয়াছেন। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি স্নান না করিয়া এত বৎসর যাবৎ আছেন কিভাবে?" "বলিস্ কিরে স্নান করিনা মানে? নিত্য ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করি। এই শরীরেই আছেরে। বুঝাবি একদিন।"

আমরা একরাত কম ঘুমাইলে ভীষণ কষ্টভোগ করি। আপনাকে তো কোনদিন ঘুমাইতে দেখি নাই। ঘুমকে কিভাবে জয় করিলেন? জবাবে বলিলেন, "যোগীদের অভ্যাস হইয়া যায়। তোরা তো নাক ডাকাইয়া ঘুমাস্। আর আমি তোদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চৌকিদারী করিয়া রাত বেড়াই।"

চৌকীদারীর প্রমাণ আমি ইম্ফলে দুইদিন পাইয়াছি। এখনও সেই আওয়াজ আমার কানে বাজে, "কেতকী, কেতকী, উঠ, উঠ, আর কত ঘুমাস্? দেখ্ কয়টা বাজে"? ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি একদিন ৩-৩০ মিঃ অপরদিন ৩-৪৫ মিঃ। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসনে বসি।

ঠাকুর দুই তিনবার উচ্চারণ করিয়াছেন, "আমার মধ্যে দুই শিশুর জন্ম হইয়াছে।" জিজ্ঞাসা করিলে অন্য কথায় চলিয়া যান। আরেকদিন বলেন, "কালীবিদ্যায় সিদ্ধ হইলে কৃষ্ণজন্ম এবং তারাবিদ্যায় সিদ্ধ হইলে রামজন্ম হয়।" তিনি তো সকল বিদ্যায়ই সিদ্ধ ছিলেন।

॥ এগারো ॥

১৯৮২ ইংরাজী হইতে ১৯৮৯ ইংরাজীর ৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঠাকুরের অন্তিম লীলার শেষ কয়েক বৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রিয় সত্য প্রকাশে অশান্তি সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সমাপ্ত করিব। আমার উদ্দেশ্য ঠাকুরের মহিমা এবং স্বরূপের যে সামান্য পরিচয় বা অনুভূতি লাভ হইয়াছে সদ্গুরুসঙ্গের মাধ্যমে তাহা ভক্ত সাধকদের ও জনসাধারণের অবগতি ও মঙ্গলার্থে প্রকাশ করা।

রাণীবাড়ীর গৃহস্থাশ্রমে সমাধিমগ্ন যোগী, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। সেবাকার্য্যেও প্রচুর বিঘ্ন ঘটিতে থাকে। ফলে ১৯৮৬ সালে ঠাকুর আনন্দেশ্বর শিবালয়ে তাঁহার গুরুধামে যন্ত্রমন্দিরে আসন পাতিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঠাকুরের জন্য মন্দির তৈয়ার হইলে সেখানে আসন পাতিলেন।

অপূর্ব্ব সেই ক্ষেত্র। গৃহস্থাশ্রম হইতে সম্পূর্ণ আলাদা এক তপঃভূমি যেখানে গেলে ও কিছুক্ষণ বসিয়া ইষ্টচিন্তা করিলে আর সংসারে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছ হয়না। এই শিবমন্দির ও যন্ত্রমন্দির গুরু আনন্দময় ব্রহ্মচারীর অবস্থানকালে গুরুর নামে তৈয়ার করেন ঠাকুরের মেজদিদি সিদ্ধাযোগিনী অর্চ্চনা ব্রহ্মচারিণী। সুতরাং তিনজন মহাসিদ্ধ-মহাসিদ্ধার তপ প্রভাবে এই পূণ্যভূমি মহাপীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে মহাতীর্থে পরিণত হইবে। অপপ্রচার সন্দেহে যেকোন সম্প্রদায়ের ভক্তসাধক এই মহাপীঠ দর্শন করিয়া সত্যতা প্রমাণের জন্য এই গ্রন্থকারের অনুরোধ। গুরুদেব স্থূলদেহে নাই। আমিও অনেকেই থাকিবে না। কিন্তু এই তপভূমি শুদ্ধসত্ত্ব, প্রেমময়, মহাযোগেশ্বর, জগন্নাথের নরলীলার সাক্ষাৎবহন করিয়া চলিবে যুগ-যুগান্তর ঘটিয়াছিল বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে।

রাণীবাড়ী আশ্রমে এইবার প্রধান সেবিকার ভূমিকায় কুমারী অপর্ণা ব্রহ্মচারিণী (শুক্লা) মহাসিদ্ধা অর্চ্চনা ব্রহ্মচারিণীর পৌত্রী এবং শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সাধক সাধিকার বংশে জন্ম বলিয়াই বোধহয় তাহার মধ্যে সহজাত প্রেমভক্তি, সেবানিষ্ঠা, সততা, সরলতা, পর-দুঃখে কাতরতা প্রভৃতি দৈবগুণ সকল ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিল। বি, এ, বি, টি, পাশ, শিক্ষিতা, রূপগুণ সম্পন্না মেয়ে স্কুলের চাকুরী ছাড়িয়া গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিল। গুরুদেব খুশী হইয়া নির্ভরযোগ্য সেবিকার নাম দিলেন, "গুরুদাসী।"

সব অবতার, মহাপুরুষদের লীলাতেও দেখা যায় আনন্দের সাথে সাথে কিছু নিরানন্দ, অসন্তোষ ও অশান্তি কমবেশী ঘটিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে খেলা জমেনা। সাধনে শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। তবে জয় কিন্তু ভক্তির।

সুন্দর তপোবন গাছ গাছপালা লতাপাতায় ঘেরা এক অপূর্ব্ব পরিবেশ, ঠাকুরের তপঃ প্রভাবে এক অপ্রাকৃত ধাম।

সর্ব্বদা স্বার্থচিন্তা থাকিলে প্রেমভক্তি লাভ হয়না। বাহিরে ভক্তির অভিনয় করিলেও সময়ে আসল স্বরূপ ধরা পড়ে। আমি কখনও সেবক ছিলাম না। বিদেশে থাকিয়া তো সেবা হয়না। আমার ভক্তিও কম। সামনে আসিলেও সেবার কাজ তেমন করিতে পারিতাম না। তবে ঠাকুর যাহাতে কুশলে থাকেন, আনন্দে থাকেন, এবং তাঁহার সেবায় ত্রুটি না হয় এইচিন্তা সবসময় করিতাম। সেবক সেবিকাদের প্রেরণা দিতাম। আমার ভাই কুশী যখনই আসিত, পরম নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের সেবা করিত এবং যথাসাধ্য শুক্লাকে সাহায্য করিত।

গুরুদাসীর সেবা নিষ্ঠায় বোধহয় দেবতারা ও ঈর্ষা করিতেন। ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব সে নিলে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। পিতা শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ ভট্টাচার্য্য, বড় দাদা শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য, মেজদাদা শ্রীরামদাস ভট্টাচার্য্য ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্য সকলেই যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেন। মাতা শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না দেবী বাৎসল্যভাবে মামাশ্বশুর তথা গুরুদেবের সেবায় আত্মনিযোগ করেন।

গ্রামে শিষ্য সেবকের তো অভাব নাই তবে সকলেই সংসার নিয়া ব্যস্ত। সর্ব্বদা সমাধি মগ্ন, ব্রহ্মবিৎ অতি বৃদ্ধ শিশুর মত আচরণশীল শিব গুরুর সেবা করার মত ধৈর্য্য সকলের নাই এবং সম্ভব নয়। ভগবান নিজের ব্যবস্থা নিজেই করেন ভাবিয়া বেশ আনন্দ হয়। ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেন, "অনেক সময় হইয়াছে এবং আমার জন্য সকলেরই কষ্ট। আমাকে তোরা হাসিমুখে বিদায় দে। আমি শরীর ছাড়িলেও থাকিব, যেমন পূর্ব্বে ছিলাম ও বর্ত্তমানে আছি।" ঠাকুর শরীর ছাড়িয়া দিবেন এইকথা যেন ভাবিতেও পারিনা। প্রার্থনা জানাইলাম আমার অবসর গ্রহণ পর্য্যন্ত যেন স্থূলদেহে থাকেন যাহাতে মাঝে মাঝে আসিয়া একটু কাছে বসিতে পারি, একটু সেবা করিতে পারি এবং একটু কীর্ত্তন শুনাইয়া অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। "নারে ভাই, এতদিন থাকা সম্ভব নয়। ৯৫ বৎসর বয়স হইয়া গেল। এখন যাওয়াই ভাল।" তোরা তো এখন সাবালক। চিন্তা

কি ? তাছাড়া আমি তো মরিবনা। পার্থিব শরীর সকলকেই ছাড়িতে হয়। তোদের মধ্যেই থাকিব। খুব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করবি। আমার একান্ত ভক্তরা আমার দর্শন পাইবে কীর্ত্তনের আসরে।" তিনি তো তাঁহার কথা বলিয়া গেলেন। আমাদের বুক ফাটিয়া যায়। এই অশান্তিময় সংসারে একজন বন্ধু, প্রাণের আপনজন পাইয়াছিলাম, যদিও বুঝিলাম অনেক দেরীতে ; তাঁহাকে হারাইয়া বাকী জীবন কিভাবে কাটাইব। মাথার উপরে ছাতা কে ধরিবে ? স্নেহস্পর্শে কে তাপিত হৃদয় শীতল করিবে ? মধুরবাক্যে কে গীতামৃত পান করাইবে ?

ঠাকুরের অবস্থা দর্শন করিয়া গুরুগিরির উপরে আমার রীতিমত ঘৃণা জন্মিল। গুরুর দেওয়া একাক্ষরের ঋণ কোটীজন্মে পরিশোধ করা যায় না। জগতের মালিক হইয়া ভিখারীর মত অসহায় জীবনযাপন, অষ্টসিদ্ধি যাঁহার করতলগত, সমস্ত শক্তির অধিকারী হইয়াও অসহায় পরমুখাপেক্ষী, সমস্ত জীবজগতকে আজীবন কৃপা করিয়া নিজে যেন করুণার পাত্র। শিষ্য করিয়া লাভ কি ? দীক্ষাদান করিয়া সকলের পাপের বোঝা কাঁধে নিয়া কি হইল যদি কেউ মানুষ না হইল ? গুরুতে প্রাণ না হইল ? রাগে, দুঃখে শরীর জ্বলে। মহাপ্রভুর কথা ভুলে যাস্ কেন ?

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরি।"

"পার্থিব সুখদুঃখ এই দেহপিণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া। দেহটাকেই যদি জীবন সর্ব্বস্বভাব, তবে তোমাদের জ্ঞান হইল কোথায় ? যতক্ষণ নশ্বরদেহ এবং অবিনশ্বর আত্মার জ্ঞান না জন্মে আত্মার উপলব্ধি না হয় ততক্ষণ বদ্ধজীব। তুমি সৎ পদার্থ আত্মা। দেহের জন্য এত ভাবনা কেনরে ? গীতায় কি বলিয়াছেন ?"

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারোঢ়ানি মায়য়া॥"

শিশুকে লক্ষ্য কর। আগুনে হাত পুড়িবে বলা সত্বেও হাত দিবে। সে তো কষ্ট পায়ই, মার কি কষ্ট কম ? মার চেষ্টাযত্নের অভাব নাই যাহাতে প্রত্যেকটি সন্তান ভাল হয়, মানুষ হয়। তবুও ব্যতিক্রম হয়।

রামপ্রসাদ গান গাইতেন 'কু-পুত্র অনেক হয় মা, কু-মাতা নয় কখনও তো।' কু-পুত্র বিপদে পড়িলে মা সকলের আগে যায়। ভগবান সদ্গুরু সকলের মা তাঁহার মান-অপমান বোধ নাই। শিষ্যকে গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্য্যন্ত গুরুর রেহাই নাই।

গুরুদ্রোহীর ভয়ানক কষ্ট হয়। যাহার কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে, পরিণাম চিন্তা আছে, সে কখনও গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। গুরু নানক বলেন, মনমুখী গোঁয়ারা, গুরুমুখী ভগবৎ প্যারা"। শিক্ষা দীক্ষা যত বাড়িতেছে, জড় বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে, আধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অবমাননায় মানুষ তত নীচে নামিতেছে। মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অবনতি দেখিয়া ভগবান ও চিন্তিত। সকলেই যেন বিনাশের জন্য প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। কিছু সংখ্যক শুভ চিন্তক সত্যের পূজারী, ভক্তিপথের বা পরমার্থ পথের পথিক যাহারা, তাহাদের হয়রানি বাড়িয়া যাইতেছে। তবে এক কথা জানিয়া রাখ, সত্যের জয় হইবেই। মানুষ ঠেকিয়া শিখে। একান্ত নিজস্ব বিপদে পড়িয়া মানুষ দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ দিয়া দৈবের কাছে প্রার্থনা জানাইতে বাধ্য হয়। তুমি ঈশ্বরের দিকে এক পা অগ্রসর হইলে তিনি তোমার দিকে দশ পা অগ্রসর হইয়া আসেন তোমার সাহায্য করিতে। এখনও জগতের ধ্বংসের অনেক বাকী। শুভবুদ্ধির আশ্রয় লও। 'মানব জন্মেরশ্রেয়ঃ সাধন, কীর্তি রেখে সুখে মরণ'। কবির কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য।

করিমগঞ্জ জেলার একটি গ্রামে একবার বেড়াইতে গেলাম এক নমশূদ্র বাড়ীতে। গৃহস্থ পরিবার। বাড়ীতে মাটির ঘর হইলেও নিকানো। তুলসীবেদী এবং মানুষগুলির সরলতা, শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া মনে হইল মহাত্মাগান্ধী এদের 'হরিজন' নাম দিয়াছিলেন সত্যসত্যই এরা হরিরজন। ঠাকুরকে বলিলাম, যদি গুরুকৃপা পাই তবে ভবিষ্যতে এদের মধ্যে আমার আশ্রম করিয়া জীবরূপী হরিগুরুর সেবা করিয়া বাকী জীবন কাটাইয়া যাইব। ঠাকুর শুনিয়া খুব খুশী হইলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন। সনাতন ধর্ম্মটিকিয়া আছে বা থাকিবে এইসব সহজ সরল সাধারণ মানুষের ভক্তি বিশ্বাসের জোরে। এদের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছি বহুভক্ত বৈষ্ণব।

যেখানে শিক্ষার অভাব, একটু সাহায্য করিলে, স্নেহের স্পর্শ দিতে পারিলে আমার ঠাকুরের ধর্ম্মাদর্শ সত্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। মানবতাই যুগধর্ম্ম।

একমাত্র ছেলে শ্রীমান কিশলয় (রাজু) মাধ্যমিক কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছে। সামনে পত্রীকারিষ্ট, ছেলের পরমায়ু নিয়া মা বাবার চিন্তার শেষ নাই। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গ্রহশান্তির জন্য কিছু করিব কি না। বলেন, "কীর্ত্তন দান কর"। ভাবিলাম ঠাকুরের সামনেই তবে কীর্ত্তন হইক। ১৯৮৭ ইংরাজীতে মাকরী উৎসবে গেলাম সপরিবারে এবং কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলাম। ঠাকুর ছেলেটিকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। আমরা ও নিশ্চিন্ত হইয়া গেলাম। বিশ্বাস থাকিলে হরিনাম কীর্ত্তনে পাপতাপ গ্রহশান্তি সবই হয়। একবার কৃষ্ণনামে সর্ব্বপাপ হরে। হরে'নামৈব কেবলম্।

উৎসবের কয়েকদিন পরে আমিও তপু (বিমান কান্তি সেন) করিমগঞ্জ হইতে নানাবিধ ফল, মিষ্টি ও ঠাকুরের সেবার কিছু জিনিষ খরিদ করিয়া নিয়া আসিলাম। রাত্রে কীর্ত্তন হইবে, ভক্তরাও আসিবে। আমরা চিন্তা করিলাম রাত্রে কীর্ত্তনের জন্য সবরকমের ভোগের সামগ্রী পৃথক রাখিব এবং অগ্রভাগ ঠাকুরকে দিয়া দিব। ভাগ করিতে বসিলাম। ঠাকুর যেন কিছুই বোঝেন না ভাব ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কিসের ভাগবাটোয়ারা চলছেরে?" "রাত্রের কীর্ত্তনের জন্য নারায়ণের একভাগ এবং গুরুর একভাগ। "তবে দে আমার হাতে আমি গ্রহণ করি। কমলালেবু আমাকে কয়টা দিলি আর নারায়ণকে কয়টা দিলি? ভাগ তো সমান হইল না"। নারিকেল তিনটা ছিল। ঠাকুরকে একটা এবং নারায়ণকে দুইটা দেওয়ার সিদ্ধান্ত শুনিয়া একেবারে চটিয়া গেলেন। "কি" আমি জীবন্ত গুরুকে অবজ্ঞা? আমাকে নারিকেল মাত্র একটা আর নারায়ণ শীলা পাইবে দুইটা? লইয়া যা সব, আমি কিছুই গ্রহণ করব না"। আমরা তো অপ্রস্তুত। জীবন্ত হরি তো আমাদের নাচাইতেছেন এই জ্ঞান তো আমাদের নাই। অবশেষে গুরুদাসী সমাধান বাহির করিয়া দিল। বলে, "মেজদা সব উঠাইয়া ঠাকুরকে দাও।

তুমিই আমাদের গুরু নারায়ণ"। ঠাকুর আনন্দে বলিয়া উঠেন, দে দে সব আমার হাতে দে। (আমাকে দিলেই নারায়ণ পাইবে। ওরে গুরুও নারায়ণ অভিন্ন) গুরুর সাক্ষাতে অন্য পূজা, জপ ধ্যান করিলে নিষ্ফল হয়। গুরুর প্রীতির জন্য গুরু যাহা বলেন তাহাই শুধু করিতে হয়। তোরা বালক, আর এমন ভুল করবি না"। চোখ খুলিয়া গেল সেই দিন।

"১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে হঠাৎ আদেশ আশ্রমে সাত্বিক দুর্গাপূজা কর এবং সকলকে খবর দাও"। ইতিমধ্যে আমার বদলীর নির্দ্দেশ আসিয়াছে ত্রিপুরাতে। দুর্গাপূজার পূজক আমাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে শুনিয়া বদলীর সঙ্গে ২০ দিনের ছুটি নিয়া রওয়ানা হইলাম। ধর্ম্মনগর পৌঁছিয়া আমার মাসীর বাসায় উঠিলাম এবং একদুই দিনের মধ্যে রাণীবাড়ী আশ্রমে যাইবার কথা। রাত্রেই জ্বর উঠিল। জীবনে এই প্রথম জ্বর হয় আমার। ঠাণ্ডা জলধারা, বরফ দিলে জ্বর নামে ১০২° পর্য্যন্ত এবং উপরে উঠে ১০৬° পর্যন্ত। ডাক্তাররা বিপদ দেখিয়া আমার বোন ও মাসীমাকে জানাইলেন স্ত্রী পুত্র থাকিলে টেলিগ্রাম করিতে। বেহুঁশ হইয়া পড়িলে ও ভিতরে আমার জ্ঞান আছে। একই দুঃখ ঠাকুরের সাত্বিক দুর্গাপূজা করিতে পারিব না। আশ্রমে খবর পাঠাইবার উপায় ও নাই পূজার আগে।

শ্রীরামচন্দ্র আশ্বিন মাসে অকালবোধন করিয়াছিলেন রাবণবধের জন্য। এই অকাল বোধন কোন উদ্দেশ্য? না কি নারীজাগরণের জন্য? নারী শক্তির জাগরণ না হইলে ভারতের বিনাশ হইবে। কেউ আটকাইতে পারিবে না।

আমার কোন খবর না পাইয়া আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমনৈষ্টিক শ্রীযুক্ত কৃপেশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ভগবতীর পূজা শুরু করিলেন। সকলেই আমার জন্য চিন্তা করেন। ঠাকুর বলেন যে, "সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তবে আসবে পূজার অষ্টমী দিনে। সে আসিলেই একগ্লাস গরম দুধসাগু দিবি ও একখানা বিছানা আমার সামনে পাতিয়া রাখ"। সেবিকা গুরু-দাসী নির্দ্দেশ মত সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে।

মাসীমাকে বলিলাম, ডাক্তারের কথা আমি শুনিয়াছি। মৃত্যু যখন

অনিবার্য এখানে রাস্তায় মরিব না। কর্মস্থলে ও গেলাম না। স্ত্রীকে টেলিগ্রাম দেওয়ার দরকার নাই এখন আমাকে আজই, নয় তো কাল সকালবেলা একজন লোক সঙ্গে দিয়া রাণীবাড়ীতে পাঠাইয়া দাও। ঠাকুরের সামনে গিয়া মরিতে চাই। রাস্তায় মরিলেও দেহ ঠাকুরের কাছে পৌছিবে এবং আমার ভাইরা দাহসংস্কার করিবে। অগত্যা মাসী রাজী হইয়া মা ভগবতীর চরণে অশ্রুবিসর্জন দিয়াও আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাকে পাঠাইলেন রাণীবাড়ীতে টেক্সি পৌঁছিল বেলা প্রায় ১১টায়। ঠাকুরের কাছে আমাকে নিয়া গেলেন ভাই কৃপা ও বিশ্বনাথদা ধরাধরি করিয়া। ঠাকুরের নির্দ্দেশ মত দুধ, সাগু ও একগ্লাস জল খাওয়াইয়া গুরুদাসী বিছানায় শুয়াইয়া দিল।

আমার অবস্থা দেখিয়া ভক্তদের আনন্দ মাটি হইয়া গেল। ভাই-বোনদের চোখে জল। কথা কি হয়। গ্রামবাসীরা ও খবর নিতেছেন যেহেতু সকলেই আমাকে ভালবাসে। মৃত্যু সময়ে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে কেহই সামনে থাকিবে না বলিয়াও আপশোষ অনেকের।

হঠাৎ ঠাকুর আসনে বসিয়া হুংকার দিতে শুরু করিলেন। আমি তো চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিতেছি। অপেক্ষা কখন প্রাণ বাহির হয়। ক্রমশঃ আমার শরীর শীতল হইতে লাগিল এবং ঠাকুরের শরীর জ্বরের উত্তাপে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, বেহুঁশ হইয়া আসনে পড়িয়া গেলেন। খবর রটিয়া গেল শিষ্যকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে গিয়া গুরুদেব বোধহয় শরীর আজই ছাড়িয়া দিবেন। কেউ কেউ বলিলেন না আজ অষ্টমী, বিজয়া দশমীতে মা ভগবতীর বিসর্জন হওয়ার পর গুরুদেব ও দেহ ছাড়িবেন তোমরা দেখিয়া নিও। অবশ্য অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন গেলেই ভাল। দুঃখের কিছুই নাই। এই বেচারা অল্প বয়স্ক, বাচ্চারা ছোট, ইহার বাঁচার দরকার। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিধির হাতে। তোমার আমার কথায় হইবে না। তবে মহাসিদ্ধপুরুষের ব্যাপার আলাদা। মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাধীন। স্থূলদেহ ত্যাগ মাত্র। তাঁহাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। যম তাঁহাদের ছায়া মাড়ায় না ভয়ে। বিষয়ী লোক মৃত্যু ভাবনায় কতবার মরে।

দিনরাত্রি ভয়ে ভয়ে কাটিয়া গেল। নবমী দিনের সকালবেলা প্রায় ৮টায় আমার ঘুম ভাঙ্গিলে মনে হইল শরীরে আর জ্বর নাই এবং শুধু দুর্ব্বলতার জন্য মাথা উঠাইতে পারিতেছিনা। বড় কষ্টে ধরিয়া ধরিয়া বাথরুম হইতে আসিয়া একটু চা, বিস্কুট খাইয়া শুইয়া থাকিলাম। ঠাকুর ও মুখ খুলিলেন, "ওনাত্নী, কেতকী কেমন আছেরে? একটু ভাল। হারমোনিয়ামটা দিয়া ওকে বসাইয়া দে, আমাকে একটু মধুর সঙ্গীত শুনাইবে" সে বলিল, "উনি এত দুর্ব্বল, কি করিয়া গান করিবেন"? "তুই দেনা হারমোনিয়াম। পারবে গাইতে"।

আমি ৯টায় কীর্ত্তন শুরু করিলাম। আমার এত অসুস্থতা, দুর্ব্বলতার মধ্যে গান গাইতে দেখিয়া ভাই কুশী এবং অন্যান্য ভক্তরা খোল করতালে তাল দিতে শুরু করিলেন। ঠাকুর এতক্ষণ সমাধিমগ্ন ছিলেন। সমাধি ভগ্ন হইলে বলিলেন, "এখন কয়টা বাজেরে?" ঘড়ি দেখিয়া কে জানাইল ১২-৩০ টা। "দাদুভাই এখন কীর্ত্তন বন্ধ কর্। খুব ভাল কীর্ত্তন শুনাইয়াছিস্। আমিও এখন সুস্থ। ওরে, তুই সকলের সঙ্গে যাইয়া প্রসাদ গ্রহণ কর্। তোর মৃত্যুযোগ প্রভুর ইচ্ছায় কাটিয়া গেল। আর তোর ভয় নাই।" প্রণাম করিয়া বাইরে গেলাম। প্রসাদ গ্রহণের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলাম এবং কাজেও লাগিয়া গেলাম যেন আমার শরীরে কিছুই হয় নাই। সবাই অবাক মানিল এত জ্বর লইয়া আমি এগারোদিন কিভাবে বাঁচিলাম। ডাক্তারী বিদ্যাও হার মানিল দৈবের কাছে।

বিজয়া দশমীতে পূজার ব্রহ্মঘট এবং নবপত্রিকা ঠাকুরের সামনে আনিয়া পুরোহিত যথারীতি শান্তিমন্ত্র পাঠ করিলেন। শক্তির খেলা শুরু হইয়া গেল ভক্তদের শরীরে। পুরোহিত বুঝিলেন তাঁহার সাত্বিক দুর্গাপূজা শিবগুরুর কৃপায় সিদ্ধ হইয়াছে। অন্য ভক্তরাও শক্তির জাগরণের আনন্দে জীবন ধন্য মনে করিল।

ঠাকুর বলিলেন. "আমাদের পূজা শেষ হইয়াছে। অপেক্ষা কেন এখনই বিসর্জ্জন করিয়া আস। তারপর বিজয়া সম্মিলনী করিয়া সকলে একসঙ্গে দুপুরের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে।" যেমন আজ্ঞা তেমনই কাজ। আমাদের অকালবোধনে, বিজয়া সম্মিলনও অকালে পালন করিয়া নিলাম।

ঠাকুর শিখাইয়াছিলেন একখানা কবিতার প্রথম পংক্তি—

"বিজয়ার মূলে সত্য প্রতিষ্ঠা
মহাশক্তির জাগরণ,
পশুত্ব জিনিয়া মনুষ্যত্ব লাভ
যুগধর্ম্ম এ বোধন।

এই পূজার ঘটনায় লোকে কিছু শিক্ষা পাইল। গুরু-শিষ্যে আত্মিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ভরতার ফল, মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা এবং যাহারা বলিত সাধুর এককালে বেশ শক্তি ছিল, এখন কিছু নাই, সেইসব পাষণ্ডদের মুখস্তম্ভন হইল। যাহারা সাধুর শুভানুধ্যায়ী অর্থাৎ এত বৃদ্ধবয়সে থাকিয়া সকলকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে মরাই ভাল, তাহারা নিরাশ হইল, যেহেতু ইনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিবেন।

কেউ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানায় ক্ষেতে জল চাই; বুড়ী জানায় রৌদ্রের জন্য, নইলে বড়ীগুলো নষ্ট হইয়া যাইবে, আবার বাঁচ্চার কাঁথা কাপড় শুকাইবার জন্য মায়ের প্রার্থনা। ভগবান সবই শুনেন এবং সকলেরই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও করেন।

ঠাকুরও বোঝেন এখন গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয়ঃ এবং সময়মত সকলেরই প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন। কেউ জীবনভর হাসিবে, কেউ কাঁদিবে; আর কেউ হাসিকান্নার যোগসূত্র ধরিয়া চলার পথে সিদ্ধান্ত নিবে।

ঠাকুর আবার নির্দ্দেশ দিলেন, "সকলকে খবর পাঠাও মাকরী সপ্তমী উৎসবে যেন সকলে উপস্থিত হয়।" এইবার মাকরী উৎসব খুব ভাল ভাবেই হইবে। প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। ঠাকুরের শেষ উৎসব। ২৭শে জানুয়ারী ১৯৮৯ সাল মাকরী সপ্তমী। তিনদিন ব্যাপী অখণ্ড যজ্ঞ এবং নাম কীর্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর অন্তিম শয্যা নিলেন। আর উঠিয়া বসিলেন না বা পাশ ফিরিলেন না। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ কেন?" "জানিস্ না ১০০টা কামান ধরিয়া আছি। হাত ছাড়িলে জগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে।" আমি মুর্খ এইসব কথার অর্থ কি বুঝি? চুপ করিয়া গেলাম।

হাওড়া হইতে শ্রীমান নবকুমার মান্না, শ্রীমান রামকুমার মান্না এবং

শ্রীমান মলয় চক্রবর্তী আসিয়াছে। আমি এবং আমার ভাইও গিয়াছি। সকলেই কিছু কিছু ঠাকুরের সেবা করিতেছি। আমি যাওয়ার আগেই শ্রীমান বিমান কান্তি সেন দাস ঠাকুরের চিকিৎসা করিতে থাকে আমি পৌঁছিলে দায়িত্ব আমার উপর পড়ে। পুরী হইতে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ব্রহ্মচারী এবং একজন উড়িয়া ভক্ত আসে। এইদিকে শ্রীমতী স্বপ্না ধর, শ্রীমান শিশির দাস প্রভৃতিও ঠাকুরের খোঁজ খবর নেয় এবং যখন যাহা প্রয়োজন করিয়া যাইতেছে। সকলেই বুঝিতে পারিলেন এই অন্তিম শয়ন, আর উঠিবেন না এবং শিষ্যদের যাহা যাহা করণীয় শিষ্যদের শিক্ষার জন্য তাহা উপদেশ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রজত কান্তি চক্রবর্তী, পৌত্রদ্বয় শংকর ও রমু সকলেই উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত এবং ঠাকুরের খোঁজ খবর নেন।

ঠাকুর বলেন, "জগন্নাথ পুরীতে যাওয়ার জন্য দূত পাঠাইয়াছেন। আমি পুরীতে চলিয়া যাইব।" আমরা বলি, "আপনি যেখানে আছেন বা থাকিবেন সেই জায়গাই তো পুরী। আপনিই তো বলিয়াছেন গুরুই জগন্নাথ। আমাকে পুরীতে যাইতে দিলে না বলিলেন, ওখানে গিয়া কি দেখবি? আমার কাছেই থাক্। আমার সেবা কর্। তবে এখন পুরীতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত কেন? "জবাব দিলেন না।

শ্রীমান মলয় চক্রবর্তীর বাড়ী ধর্মনগরে। কোহিমায় থাকাকালীন আমার সঙ্গে পরিচয় হয়। ঠাকুরের প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রায়ই আমার কাছে আসিত। একদিন প্রকাশ করে স্বপ্নে তাহার দীক্ষা হইয়াছে। আমি বলিলাম, 'স্বপ্নে দীক্ষা হইলেও সাক্ষাৎভাবে সদ্গুরুর দীক্ষা নিতে হয়। একবার শিবরাত্রি তিথিতে ঠাকুর দর্শনে যায় রাণীবাড়ী আশ্রমে এবং ঠাকুরের চরণে আশ্রয় লাভ করে। স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষিত, পরম ভক্ত ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। ঠাকুরও খুব স্নেহ করিতেন।

উৎসব শুরু হইল। প্রশ্ন উঠে, "যজ্ঞের হোতা হইবেন কে? ঠাকুরের নির্দেশ, "যজ্ঞ কেতকী করিবে" ভক্তদের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল, একদলের আপত্তি থাকায়, ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী যজ্ঞ না দিবে ঠাকুরের চক্রে আমি যজ্ঞ করিলাম এবং ঠাকুরও খুশী হইলেন। বাহিরে আরেক

অস্থায়ী যজ্ঞশালা তৈয়ার করিয়া যজ্ঞ করিলেন শ্রীনিরঞ্জন ব্রহ্মচারী। আমার ব্যপারে আপত্তির কারণ যেহেতু আমি চাকরী করি শার্ট পেন্ট পরি। ব্রহ্মচারী বেশধারী নই।

হাজার হাজার নরনারী উৎসবানন্দ উপভোগ করিল। উৎসবে উপস্থিত নরনারী মহাপুরুষের অন্তিমদর্শন করার জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। অনুমতি লইয়া পঞ্জিকা দেখিয়া বারবেলা কালবেলা বাদ দিয়া দর্শনের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল। কল্পতরুর কাছে কেহ চাহিল অর্থ, চাকরী, কন্যার বিবাহ, আর কেউ আরোগ্য। জানিনা কতজন পরমার্থ সিদ্ধির বর লইয়াছে। ঠাকুর বলেন, "যে যে বাসনা লইয়া আসিবে আমার দর্শনে, তাহা সিদ্ধ হইবে জানিও। বারবেলা, কালবেলার দর্শনে ফল হইবে না সকলকে জানাইয়া দিও।"

উৎসবের প্রথমদিনে ভোরবেলা কীর্ত্তন শুরু হইবে। মণ্ডপে লোক জমা হইয়াছে। এমন সময় হট্টগোল শুরু হইয়া গেল কি ব্যাপার? দেখা গেল এক সর্পযুগল খেলা করিতেছে। শিকারীরা তো ডাণ্ডা লইয়া প্রস্তুত বসাইয়া দেয় আর কি। তাহাদের বারণ করিলাম। মহিলারা বলিতে লাগিলেন একখানা নূতন কাপড় নীচে বিছাইয়া দিলে সর্পযুগল খেলা করিবে এবং মণি পাওয়া যাইবে। গুরুদাসী আসিয়াও দেখিল। আমি যাইয়া ঠাকুরকে এই ঘটনা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কি করা কর্ত্তব্য। ঠাকুর বলিলেন "সামান্য কিছু গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়না, নিজের বুদ্ধিতে যাহা আসে তাহা কর।" আমি নির্ভয়ে তাহাদের সামনে যাইয়া প্রার্থনা জানাইলাম. হে রাধাগোবিন্দ এখন জায়গা ছাড়িয়া দাও, তোমার কীর্ত্তন শুরু করিতে হইবে মণ্ডপে। বলামাত্র একজন নামিয়া দৌড়াইয়া বাঁশের বেড়াতে আমার ভিজা গেঞ্জির ভিতরে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইল এবং আরেকজন একটু পরে নামিয়া ঠাকুরের আসন মন্দিরের উপরে কিছুক্ষণ খেলা করিয়া অদৃশ্য হইলেন। এই খবরে ঠাকুরও খুশী হইলেন।

উৎসব শেষ হইলে একে একে ভক্তরা চলিয়া গেলেন। আমিও আমার ভাই কুণী কিছুদিন রহিলাম সেবা করার জন্য। ঠাকুরের দেহে অনেকগুলি ক্ষত হইয়াছিল। শ্রীমান বিমানকান্তি (তপু) খুব ভাল

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এবং সে ঠাকুরের চিকিৎসা করিত। আমি আশ্রমে পৌঁছার পর ঠাকুর তাহাকে ছুটি দিলেন। তাঁহার চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ভার দিলেন আমার উপর। আমি জানি এই চিকিৎসাও এক লীলা। আমাকে সেবার কাজে ব্যস্ত রাখার কৌশল। প্রথমদিন পায়ে ও শরীরে হাত দিতেই মাংস পঁচা দুর্গন্ধ আমার নাকে লাগিল। শীতে সোয়াটার গায়ে। সোয়াটারে এবং সমস্ত শরীরেই যেন দুর্গন্ধ পাইতেছি। বেশ অস্বস্তি বোধ করিতেছি। মনে জাগিল আমি কিসের গুরুভক্ত? ঠাকুরের সেবা করিতে আসিয়া ঘৃণা করিতেছি। দুর্গন্ধের জন্য নাকে রুমাল দিলে মহা অপরাধ হইবে। আমার শিষ্য সেবক হওয়ার অধিকার থাকিবে না। তাই অপরাধী মনে করিয়া নিজেকে বারবার ধিক্কার দিতেছি। অন্য ভক্তরা কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করিয়া যাইতেছি। তবে কি ঠাকুর আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? যেমন ভাবা ঠাকুর বোধহয় লজ্জা পাইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরেও সোয়াটারে এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ ফুটিয়া উঠিল আমি আমার ভাই ও অন্যরা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা।

রাত্রে বারান্দায় বসিয়া আছি। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বারান্দায় কেনরে? বাইরে শুইবার জন্য বুঝি তোকে টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আনিয়াছি? আমার কাছে থাকবি।" সেইরাত্র হইতে আদেশ হইল একই আসনে ঠাকুরের বামদিকে গুরুদাসী, ডানদিকে আমি ও আমার ভাই আমার ডানদিকে ঘুমাইবে। ঘুম কোথায়? সারারাত আমরা গল্প করিতাম, গীতার আলোচনা করিতাম কিংবা কীর্ত্তন করিতাম। মাঝে মাঝে একটু ঔষধ অথবা ত্রিফলার জল বা মৃতসঞ্জিবনী সুরা, দুধ ঠাকুরের মুখে আহুতিমন্ত্রে যথা ওঁ আব্রহ্ম ভুবর্শর্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ তৃপ্যন্ত পিতরো সর্ব্বে মাতৃমাত মহোদয়ঃ, অতীত কুলকোটীনাং, সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং ময়াদত্তেন ভোগেন তৃপ্যন্ত ভুবন ত্রয়ং স্বাহা, ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং সমস্ত জগৎ তৃপ্যতু স্বাহাঃ।

তোমরা গীতার আলোচনা কর, আমি শুনি কিংবা একটু কীর্ত্তন কর। রাত হয়তো তখন ২টা বাজে। এক দুই ঘন্টা বড়জোর আমরা বিশ্রাম করিতাম বা ঘুমাইতাম। বয়োঃ জ্যেষ্ঠ হিসাবে আমার কিছু

আরাম হইত। বোন গুরুদাসী ও ভাই কুশী বেশী কষ্ট করিত রাত তিনটায় উঠিয়া মঙ্গলারতি শুরু করিতাম। ৪টা হইতে ৫টার মধ্যে এক বা'র চা হইয়া যাইত। প্রতিবেশীরা জিজ্ঞাসা করিত, "রাত্রে আপনারা ঘুমান কখন, সারারাত কথা ও কীর্ত্তন শুনি আমরা"। সারাজীবন তো ঘুমাইয়া কাটাইলাম এবং ঘুমাইয়া কাটাইব বাকী জীবন। একটু সুযোগ যখন পাইয়াছি ঠাকুরকে নিয়া আমরা আনন্দ করি। আর তো এমন সুযোগ জীবনে আসিবে না।

"ওরে একটু দশকুশী তাল বাজাইয়া শুনা আমাকে। দশকুশী তালে অনর্থ নিবৃত্ত হয়"। কি আর করি? যেমন আজ্ঞা, খোল লইয়া দশকুশী তাল বাজাইয়া শুনাইতাম। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া যান এই তালে। যখন খোল বাজাইতাম ও আস্তে আস্তে "জয়গুরু জয়গুরু, প্রেমকল্প তরু." গান গাইতাম আমার ও প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। মনে হইত কোন অপ্রাকৃত ধামে আছি যেখানে কেবল দিব্যজ্যোতি, কেবল আনন্দ বিরাজ করিতেছে"। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইলে বলিতেন, "বড় আনন্দ পাইলাম, এখন বিশ্রাম কর। সিগারেটের ভোগ দে"। সিগারেট যজ্ঞের অগ্নিতে জ্বালাইয়া মুখে দিয়া বলিলে একদুই টান দিয়া বলিতেন, "তুই প্রসাদ গ্রহণ কর্"।

দিনের বেলা অনেক ভক্ত যেমন শ্রীযোগেন্দ্র কুমার দেব (খোকা) গুপ্ত প্রভৃতি থাকিত এবং পাঁচ ছয়জনে ঠাকুরকে তুলিয়া ধরিতে হইত বিছানার চাদর প্রভৃতি বদলাইয়া দেওয়ার জন্য। যেদিন মানুষজন নাই হয়তো আমরা দুইজন আছি, একটু প্রার্থনা জানাইলে শরীরের ওজন কমাইয়া দিতেন। একজনে শিশুর মত তাঁহাকে উঠানো যাইত আর কোনদিন ছয়সাত জোয়ান অতিষ্ঠ হইয়া যাইত। অষ্টসিদ্ধির প্রয়োগ গোপনে করিতেন আমাদের বিশেষ অনুরোধে। আমরা যাহা বলিতাম তাহাই করিতেন। এতদয়া প্রেমের ঠাকুরের।

নিজের সাক্ষাতে শিবরাত্রিতে সচ্চিদানন্দ নাথেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করাইয়া গুরুদাসীকে বলিলেন, "এখানে আমি চিরকাল থাকিব। আমার সেবা পূজা করিবে এবং আমার আসন যেমন আছে তেমনই থাকিবে"।

একদিন দুপুরে একা সুযোগ পাইয়া ভাবিলাম, তুমি যদি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ শিব হও তবে আজ তোমার শরীরে সাক্ষাৎভাবে শিবলিঙ্গের স্নান, পূজা করিব। ফুল, বেলপাতা, চন্দন ও জলদিয়া স্নান পূজা করিলাম। আপত্তি করিলেন না। বরং বলিলেন, "গুহ্যে ও একটু জল দিতে হয়"। তাই দিলাম এবং শিবের প্রণাম করিলাম। ইতিমধ্যে মন্দিরে ঢুকিল ভাই কুণী ও গুরুদাসী। এইসব কি কর? আমরাও পূজা করিব। বলিয়া দিলাম যেমন আমি করিয়াছি। ঠাকুর কোন কামনা অপূর্ণ রাখেন নাই আমাদের।

একদিন কিছু রাগ করিয়াই বলিলাম, "আমি তো যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি"। তেজের সঙ্গে তিনিও জবাব দিলেন, "নারদাদি সকলেই তিমিরে আছেন"। ইহার তাৎপর্য আজ পর্যান্ত বুঝিতে পারি নাই। বলিলেন, "গুরু ইচ্ছা করিয়াই একধাপ নীচে রাখেন সংসারের কাজের জন্য। সময় হইলেই শেষ কবাট খুলিয়া দেন। আর জ্বালাতন করিস্না আমাকে। তোর মধুর সঙ্গীতে বড় আনন্দ হয়। একটু গান কর্। গুরুকে বেশী প্রশ্ন করিতে নাই। মনে মনে চিন্তা করিলেই জবাব পাওয়া যায়। সংগীতের মাধ্যমে অবস্থা খুলিয়া যায়। একদিন গুরুদাসীকে বলেন, "এরা দুই ভাই জগতে কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিল"। ঠাকুরকে বলিলাম, "জগতে আপনার পতিত পাবন নাম অক্ষুন্ন থাকিবে, যেদিন আমার মত পতিতাধমকে বৈষ্ণবে রূপায়িত করিবেন"। জানিনা এইস্বপ্ন কবে বাস্তবে পরিণত হইবে। পরিবার সংসার নিয়া এত ব্যস্ত যে পরমার্থ চিন্তার সময়ই নাই। পদে পদে কেবল বাধা, অশান্তি একটার পর একটা, কে যেন নেপথ্যে আমার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। একটাই ভরসা; ঠাকুর প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন অন্তিমকালে নিজে আসিয়া নিয়া যাইবেন।

"ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবেৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যান। শরীর হইতে মাংসের টুকরা ঝরে, শীতল জল ঝরে পায়ের তলায় ক্ষত হইতেছে। প্রশ্ন করিলে বলেন, হিমালয়ের বরফগলা জল। শরীরে ক্ষত হইয়াছে রাশিয়ার ভূ-কম্পে এবং কিছুদিন পূর্ব্বে যে ভূ-কম্প হয়

বিহারের দ্বারভাঙ্গায় এবং নেপালে।

রাধাগোবিন্দ মন্দির ও শিব-মন্দিরের মধ্যে বেশ ব্যবধান। রাস্তার মাচাতে লাউগাছের একটা ডগা লতাইয়া রাস্তার উপর আসিয়া আসা যাওয়া কালে মানুষের চোখে মুখে লাগে। আশ্রমের কাজের মেয়েটি ঝুলন্ত ডগাটি মোচড়াইয়া মাঁচার উপরে উঠাইয়া দেয়। ইহাতে ঠাকুরের হাতে ভীষণ চোট লাগে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গালাগালি করিতে থাকেন। কারণ জানিয়া গুরুদাসী সেই ডগাটিকে ঠিকমত মাঁচার উপর রাখিয়া আসে এবং ঠাকুরের হাতে মালিশ করিয়া দিলে তিনি সুস্থ হন। আদেশ দিলেন এই আশ্রমের কোন গাছ, লতা যেন কাটা না হয়। এরা সবাই জীবন্ত!

তাঁহার অপ্রকট অবস্থার একটা ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল। করিমগঞ্জের বাঁশবাড়ীর এক মুসলমান (নাম মনে আসিতেছে না।) আশ্রমের গাছে লুকলুকি পাড়িতে যাইয়া গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া দিল। সেইরাত্রে ঠাকুর তাহার বুকে পা দিয়া বসেন, – "আজ তোকে শেষ করিব। বেচারা ভয়ে খুব অনুনয় বিনয় করিয়া ক্ষমা চাহিলে বলিলেন, আজ ছাড়িয়া দিলাম। আর কখনও আশ্রমের গাছে উঠিবি না, ডাল ভাংবিনা এবং ফলও আনবিনা। ফল বাঁচাইয়া খাইবে! বাঁচতে চাইলে কালই দশটাকা পঞ্চাশ পয়সা খরচ করিয়া মোম, আগরবাতি ও বাতাসা আমার শিবমন্দিরে দিয়া আসবি"। স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে ভয়ে সেই লোকটি পরের দিনই মন্দিরে আসিয়া এগার টাকা গুরুদাসীকে দিয়া যায় মোম, বাতাসা ও আগরবাতির জন্য।

আরও কয়েকটি ঘটনা প্রকাশ করিলে ঠাকুরের মহিমাও পরিচয় লাভে ভক্তও পাঠকদের সাহায্য হইবে। শ্রীশিশির কুমার দাস একজন শিক্ষক, পরমগুরুভক্ত, স্থানীয় ধনী ও প্রভাবশালী গৃহস্থদের অন্যতম। তাহার স্ত্রী শ্রীমতী শিপ্রা দাস খুব ভাল কীর্তন ভজন করে এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যভক্তদের একজন। একটি সন্তানের জন্য তাহাদের প্রার্থনার শেষ নাই অবশেষে একটি সুন্দর ছেলে পাইয়াছে এবং গুরুভক্তি অনেকগুণ বাড়িয়াছে। শিশির ভাল কীর্তনীয়া ও ঠাকুরের সেবক।

আমার ভগ্নীপতির ভাই শ্রীমান মুরলী ধর গোস্বামীর ছোট সময়ের মানত ছিল রক্ষাকালীর পূজা। দৈবযোগে আমরাও উপস্থিত ছিলাম রাণীবাড়ীতে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। পূজাতো আরম্ভ হইয়াছে বিধি অনুসারে এবং পূজক আমার দাদা। আমার দিদির বড় ইচ্ছা ছিল ঠাকুরকে একটু ভোগ দিবেন, কিন্তু ঠাকুর দীর্ঘকাল যাবৎ অন্নগ্রহণ করেন না বলিয়া মনের সংকল্প মনেই চাপিয়া রাখিলেন। ঠাকুর একদিন বলেন "তোমরা আমার সামনে বসিয়া তো কত কথাই তো বল, আমি শুনিনা। কিন্তু দূরে কেউ আমাকে চিন্তা করিলে বা কথা বলিলে শুনিতে পাই"।

সকালবেলা দিদি আমাকে কিছু ফল দিলেন ঠাকুরের জন্য। আমি কিছু বেলপাতা ও নিয়া গেলাম আশ্রমে। যাইতেই বলেন, "দেখি আমার জন্য কি কি এনেছিস্? বেলপাতাগুলি দেখিয়া বড় খুশী হইলেন যেহেতু আজ আহুতির বেলপাতা ছিলনা। ফলগুলি গ্রহণ করিলেন। "ওরে আজ মায়ার বাড়ীতে কিছু হইতেছে মনে হয়। দেখিলাম একবেটী সাদা রং হাত ছয়খানা বোধহয় রক্ষাকালী। তবে গোঁসাইবাড়ী কালীপূজা কেন?" মানতের কথা শুনিয়া বলেন, "আচ্ছা আমাকে কেহকিছু না বলিলেও আমার নজরে পড়িয়া যায়। ভালকথা মায়া বোধহয় আমাকে ভোগ দিতে চায়। আমিতো অন্ন গ্রহণ করিনা। তবে কি করা যায় বল্‌তো? তাহার সংকল্পটা রক্ষা করা উচিত নয় কি? কে রান্না করছে? রূপেশের মেয়ে? কি কি রান্না করছে?" আমি তো দেখিয়া আসি নাই। তবুও অনুমানে কয়েকটা সাম্ভাব্য তরকারীর নাম বলিলাম এবং খিচুড়ী পায়েস তো হইবেই। শুনিয়া বলেন, "তুই এক্ষুণি যা ভোগ নিয়ে আয় আমি আজ গ্রহণ করব। তবে পায়েসটা যেন খুব সিদ্ধ করে বল্‌বি। আমার দাঁত নাই কিনা।"

আমি বলিলাম, ভোগের তো দেরী হইবে কিছু। রান্না শেষ হইলে মা কালীর ভোগ হইবে। তারপর দিবে আপনার জন্য। রাগিয়া উঠিলেন, "আরে তোর বউ আগে খায়, না তুই আগে খাস্? স্বামী আগে খায় তারপর স্ত্রী। এইটাই চিরাচরিত প্রথা। আমি বেটা, কালী বেটী সুতরাং

অগ্রভাগ আমি গ্রহণ করিলে তবে তো কালী খাবে?" গ্রামের মানুষ আপনাকে একজন সিদ্ধপুরুষ বা সাধুর বেশী ভাবিতে পারে না; অনেকে কেন? আপনার নিকট আত্মীয়রাই পাগল বলে। আপনার দুই একটি পাগল শিষ্য ছাড়া আপনাকে কেউ শিব মানে না। বৃদ্ধ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া শিশুর মত হাসিলেন।

আমার তো অন্তরে জ্বালা, মূর্খের দল স্বয়ং শিবকে হাতে পাইয়াও অবজ্ঞা করিতেছে। কি করিয়া এদের ভাল হইবে? গেলাম যেহেতু অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন যেন কতযুগ খান নাই। ক্ষুধায় যেন প্রাণ যায়। দিদিকে সব ঘটনা বলিলে আনন্দে তাহার চোখে জল আসিল।

এক পণ্ডিতের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আপত্তি করিলেন, কি অনাচার, মায়ের ভোগের আগে মানুষের খাওয়া। পূজা পণ্ড হইয়া যাইবে। দিদি বলেন, "তিনি যে ভোগ গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছেন আমার মনের সংকল্প জানিয়া, এতবড় সৌভাগ্য আমাদের, এরপরেও মানুষ বলিতেছেন তাঁহাকে? তিনিই আমাদের শিব। তাঁহার ভোগ হইলেই মা কালী খুশী হইবেন।" ভোগ লইয়া আমরা গেলাম। ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ঠাকুর, "আগে পায়েস দে আমাকে। পায়েস গ্রহণ করিয়া ডাল, তরকারী, খিচুড়ী প্রভৃতি শুধু জিহ্বায় স্বাদ দেখিলেন। খুব ভাল রান্না হইয়াছে। আমার খুব তৃপ্তি হইয়াছে বলবি। তোরা প্রসাদ নিবি, মায়াকেও দিবি।

দিদি শুনিলেন ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন। কালীর ভোগ এখনও দেওয়া হয় নাই। পূজা চলিতেছে। পূজক যখন এই ঘটনা শুনিলেন, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি পূজা করিব? পূজা ভোগ সবই তো হইয়া গেল যেখানে স্বয়ং শিব নিজগুণে আজ গ্রহণ করিয়াছেন। বলিলাম, এই সত্য সকলে মানবে না। তুমি তোমার বুদ্ধি অনুযায়ী পূজার মন্ত্র বলিয়া মাকে মনেরমত ফুলবেলপাতা দিয়া সাজাও, ভোগ লাগাও, লোকের মনরক্ষা করিতে হইবে। দাদা আসনে বসিয়া চোখের জল ফেলিলেন— এবং দয়াল গুরুর জয় দিলেন। বিকালবেলা আমাকে বলিলেন, "তোমরা মায়ের গান কর। আমি শুনিব এবং শনির চারদণ্ড শেষ হইলে আসন ছাড়িয়া উঠিব।" শ্যামাসঙ্গীত হইতেছে। রাত প্রায় ৮টায় জোর করিয়া

দাদাকে উঠাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য পাঠাইলাম। সার্থক কালীপূজা জীবনে এই প্রথম করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাই জগদ্‌গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু।

মুরলীধর গোস্বামী ঠাকুরের অন্তিম যাত্রায় উপস্থিত ছিল। পায়ের ছাপ লইয়াছে ঠাকুরের। দুইখানা চরণ বুকে স্পর্শ করিয়া খুব কাঁদিয়াছে। এখনও কথাপ্রসঙ্গে সেইসব ঘটনার উল্লেখ করিলে তাহার দুইচোখ দিয়া জলের ধারা নামে। ঠাকুরের শরীরে অনেক মারাত্মক ক্ষত ছিল। কিন্তু শরীর যখন ছাড়িলেন, কোন ক্ষতচিহ্ন পর্য্যন্ত ছিলনা। এইসব দেখিয়া তো সকলে অবাক। এখন শুধু অনুশোচনা — প্রায়শ্চিত্য।

আমি এবং আমার ভাই কুশীর ছুটি শেষ হইলে ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে ঠাকুরের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইলাম। খুব স্নেহের সহিত বিদায় দিলেন এবং মুখের একটু প্রসাদও আমাদের হাতে শেষবারের মত দিলেন। আমাদের অবস্থা প্রকাশ করার মত ভাষা নাই। ঠাকুর, আর তো তোমাকে এমনভাবে দেখিব না, পাইব না তোমার বুকে শুইতে পারিব না, তোমার একটু সেবাও করিতে পারিব না। বাকী জীবন মাথুরের বিরহ জ্বালায় জ্বলিয়া যদি দেহান্তে তোমার চরণে ঠাঁই পাই।

ঠাকুর, "আমাদের ছাড়িয়া আপনি চলিয়া যাইবেন। আমাদের জন্য কি আপনার একটুও দুঃখ হইবে না? এমন একটা প্রশ্ন শুনিয়া তিনিও বিচলিত হইয়া গেলেন ক্ষণকাল। জবাব দিতে পারিলেন না। একটু থামিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার অঙ্গ। তোমাদের ছাড়া আমার চলিবে কি করিয়া? তোমরা আমার কাছেই আসিবে। এখন আমার কাজ করিয়া যাও। আমি তো তোমাদের মধ্যেই থাকিব। শুধু স্থূলদেহটা থাকিবে না।"

গুরুদাসীর কাছে গচ্ছিত গুরুফাণ্ডের চারিখানা পাস বুক, আনুমানিক নব্বই হাজার টাকার মত হইবে, আমার অমতেই আমাকে সমঝাইয়া দেওয়া হইল। আমার অসম্মতির যুক্তি তর্ক শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন "আইনতঃ পিতার পার্থিব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় পুত্রেরা। আর পুত্র উপযুক্ত না হইলে গুরুর পরমার্থ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় উপযুক্ত শিষ্য সন্তান যাহাকে গুরু প্রসন্ন হইয়া এই অধিকার প্রদান করেন।

আমার অবর্ত্তমানে যদি এই পাস বুকের সঞ্চিত গুরুফাণ্ডের অর্থ পুত্রদের দাবীতে হস্তান্তর করিতে হয় তবে জানাইয়া দিবে যেন এই অর্থ নষ্ট করা না হয়। গুরুফাণ্ডে হিসাবে থাকিলে সকলের মঙ্গল হইবে এবং ভবিষ্যতে উৎসবাদিতে কিছু কিছু ব্যয় করিলেও ফাণ্ড নষ্ট হইবে না"। যেহেতু আলাদা রেজিষ্টার্ড কোন আশ্রম ট্রাষ্ট হয় নাই, ঠাকুরের পুত্রেরা এগার-দিনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া সেই দিনই বিকাল বেলা উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের সামনে তাহাদের পিতার নামে সঞ্চিত অর্থ ও পাসবুক হস্তান্তর করার জন্য এবং আইনত: উত্তরাধিকারের দাবী তুলিয়া চাপ সৃষ্টি করিলেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ভাবী অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং গুরুদেবের সম্মানার্থে সকলের সামনে পাসবুকগুলি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রজত কান্তি চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলিয়া দিলাম। ঠাকুরের অন্তিম ইচ্ছা এবং আদেশ ও জানাইয়া দিলাম। পিতা হইলেও ঠাকুর ছিলেন সকলের দীক্ষাগুরু। এই সময়ে ঠাকুরের অপর দুই পুত্র, শিষ্যও ভ্রাতুষ্পুত্র ৺কৃষ্ণ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অপর ভ্রাতুষ্পুত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীযুক্ত করুণাময় চক্রবর্ত্তী এবং গ্রামের কয়েকজন ভক্ত ও নিমন্ত্রিতরা উপস্থিত ছিলেন

এই ব্যাপারে স্থানীয় ভক্ত শিষ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের ভক্তদের মধ্যে বেশ অসন্তোষ দেখা দেয়। অনেকেই আমাকে দোষারোপ করিতে থাকেন। কেউ কেউ মন্তব্যে অভক্ত কাপুরুষ আখ্যা দিতেও কার্পণ্য করেন নাই। চিঠিপত্রেও সাক্ষাতে আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, যে যাহা প্রণামী বা অনুদান হিসাবে দান করিয়াছ, তাহাতে তোমার তো কোন অধিকার থাকিতে পারে না। গুরুদেবকে দান করিয়াছ। এখন এই অর্থের মালিক গুরুদেব। যে প্রকৃত দাতা সাত্ত্বিক দানেই তাহার আনন্দ ও তৃপ্তি। সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য অনর্থ সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। যাঁহার কৃপাশ্রয়ে আমরা কত কৃতার্থ, জীবন ধন্য, কৈ তাঁহাকে তো আমরা চোখের জল ফেলিয়াও আটকাইতে পারিলাম না ? তিনি যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, অকাতরে বিলাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের অমর গুরুফাণ্ড। মাত্র কয়েকটি টাকা নষ্ট হইয়া গেলেও আমাদের দুঃখর

কিছু নাই। ভক্তকে চাই পরমার্থ গুরুতে শুদ্ধ প্রেম ভক্তি, যাহা আসল ফাণ্ড তাহা নষ্ট করিও না। আমরা আবার ফাণ্ড গঠন করিয়া লইব অচিরেই গুরুকৃপা বলে। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইলে পরলোকে গিয়াও আমি শান্তি পাইব না।

॥ বারো ॥

আমরা তো চলিয়া গেলাম। যাওয়ার পূর্বে এই কয়েক দিন রাত্রে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা, ঠাকুরের আদর্শ প্রচার; আশ্রম প্রতিষ্ঠা, সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া জনসেবা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিশ্বাস ভঙ্গ না করিয়া আত্মোন্নতির সহায়তা করা ইত্যাদি বিভিন্ন আলোচনা হইত। আমাকে বলিলেন, "আমার নাতনীকে দেখিস্ তুই। ওর যেন কষ্ট না হয়"।

গুরুদাসী প্রশ্ন করিল, "দাদুভাই, আপনি তো চলিয়া যাইবেন, আমাদের উপায় কি"? "আরে যাবো কোথায় এখানেই তো থাকব। মরদেহটা থাকবে না। কেতকী তোদের বড় ভাই। ওর কথা মেনে চলবি তোরা। আর শোন্, 'ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষঃ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে, নমো পিনাক হস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ" এই মন্ত্রে আমি থাকবো। এই মন্ত্রে প্রণাম করলে আমার কাছে পৌঁছবে"।

আমরা শুনিয়া তো খুশী হইলাম। মনে পড়িয়া গেল মহাভারতের কথা। শ্রীকৃষ্ণকেও এমনি দেহত্যাগের সময় যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিলে ভগবান বলেন, 'ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে, প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ' মন্ত্রে তোমরা প্রমাণ করিলে আমার কাছে পৌঁছিবে।

ঠাকুর অনেক দিন বলিয়াছেন, এই আসন মন্দিরেই যেন তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহার বাক্যের মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই যদি ও গুরুদাসী ঠাকুরের অন্তিম ইচ্ছা ও আদেশ জানাইয়াছিল।

৮ই মার্চ ১৯৮৯ সাল বাংলা ১৩৯৫ সনের ২৪শে ফাল্গুন বুধবার শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বেলা দুই ঘটিকায় প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবা মহাসমাধি যোগে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। সকাল বেলা হইতেই সেদিন

প্রাণায়াম করিতেছেন। মাঝে মাঝে কথা ও বলিতেছেন ফলের রসের ভোগও গ্রহণ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সমাধি মগ্নও হইতেছেন। গুরুদাসীকে পাঠাইলেন রাধাগোবিন্দের ভোগ লাগাইবার জন্য। তপু বারান্দায় পায়চারী করিতেছে এবং লক্ষ্য করিতেছে ঠাকুরের শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে। এখনই শরীর ছাড়িয়া দিবেন ভাবিতে পারে নাই। প্রথমবারে খুব জোরে শ্বাস টানিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দিলেন। দ্বিতীয়বার ও তেমনি করিলেন। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে শারিরীক লক্ষণ বুঝা যায়। তৃতীয়বারে শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং অসাড় শরীর পড়িয়া রহিল। তপু ভয় পাইয়া দিদিভাই দিদিভাই বলিয়া চীৎকার করিয়া গুরুদাসীকে ডাকিতে লাগিল। গুরুদাসী মন্দিরে ঢুকিয়া ঠাকুরের গায়ে হাত দিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কৌশলে গুরুদাসীকে সরাইয়া দিয়া শরীর ছাড়িরা দিলেন। সকলকে খবর দেওয়া হইল। কীর্ত্তন এবং ক্রন্দন শুরু হইল।

ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আসিলেন। প্রায় ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে সমাধির ব্যবস্থা করা হইল। পিতা পুত্র সমন্ধের দাবীতে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার মৃতদেহ উঠাইয়া লইয়া গেলেন এবং রামেশ্বর আশ্রমের (গৃহস্থাশ্রমের) টীলার নীচে মাটিতে সমাধি দিলেন।

এখনই তো হিসাব নিকাশ হইবে কে কি পাইল, কে কি হারাইল। আমরা ৪ | ৫ দিন পর খবর পাইয়া গেলাম। পুত্রেরা এগারো দিনে পিতৃ শ্রাদ্ধ করিলেন। আমরা ঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ৪০ দিনে অশৌচ পালন করিয়া ৪১ দিনে ভাণ্ডারা করিলাম, ভাণ্ডারা উৎসবে যজ্ঞ কীর্ত্তন করা হইল। যখন আমি যজ্ঞ করিতেছিলাম কালো রংএর বিরাট কুকুর যজ্ঞ মন্দিরের দক্ষিণের দরজার সামনে বসিয়া আমার যজ্ঞ দেখিতেছিল। সে নির্ব্বিকার চিত্তে আমার কর্ম্ম নিরিক্ষণ করিল। মনে কিছু সন্দেহ হইল। আমার যজ্ঞের সবরকমের প্রসাদ শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে দিলাম এবং সে গ্রহণ করিয়া পরম নিশ্চিন্তে সেখানেই পশ্চিমদিকে মাথা দিয়া শুইয়া রহিল। করিমগঞ্জ পোষ্ট অফিসে কাজ করে আমার গুরুবোন স্বপ্না ধর (কুমারী) অবজ্ঞাও বিদ্রূপ করাতে উঠিয়া চলিয়া গেল আর

পাওয়া গেলনা। সকলের খুব দুঃখ হইল। প্রভুর মহিমা বুঝিয়া ভক্ত-দের চোখে জল আসিল।

ভাণ্ডারা উৎসব শেষ করিয়া ভক্তরা বিদায় নিলেন। গুরুও বোধ হয় অনেকের জীবন হইতে বিদায় নিলেন। যাহারা গুরুকে সাধারণ মানুষ ভাবিত, তাহাদের জন্য গুরুর মৃত্যু হইয়া এক অধ্যায় শেষ হইয়া গেল। আর যাহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত তাহাদের অন্তরে বিরহ জ্বালা থাকিলেও জীবনের নূতন অধ্যায় শুরু হইল।

অপ্রকটে অনেক লীলা করিয়াছেন এবং নিত্য লীলা করিয়া যাইতে-ছেন। গ্রামের লোকেরা প্রায়ই স্বপ্নাদেশ পাইয়া সমাধিতে, শিবমন্দিরেও শ্রী শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দিরে আসিয়া কীর্ত্তন করিয়া যায়। কয়েকমাস আগে ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের উকিল শ্রীদুর্গাদাস শর্ম্মার ভাইকে স্বপ্নে দেখা দিয়া, বলেন -- 'তুই আমার সমাধিতে মোম ও ধূপকাঠি জ্বালাইয়া দিলে তোর ভাল হইবে। দেখ্ আমিকে? আমি রাণীবাড়ীর তোষসাধু"। ছেলেটি পরের দিনই আসিয়া ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইয়া মোম ও আগরবাতি নিজের হাতে জ্বালাইয়া দিয়া গেল। গত নভেম্বর মাসে গ্রামের প্রতাপ পালকে স্বপ্নে বলেন সমাধিতে কীর্ত্তন করার জন্য। গ্রামবাসী মিলিয়া কীর্ত্তন করিল। মেয়ে লোকেরা প্রায়ই কীর্ত্তন করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে রাণীবাড়ীতে গেলে পুরুষ, মহিলারা এবং যুবকরাও রাণীবাড়াতে স্থায়ী আশ্রম করার জন্য অনুরোধ করে। এখন অনেকের মুখেই শোনা যায় এই সাধু স্বয়ং ভগবান; ইনিই শিব, ইনিই মহাপ্রভু। ঠাকুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়া মাঝে মাঝে ওঁকার করিতে করিতে আনন্দময় কোষ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেন।

ঠাকুরের শক্তি অনেক ভক্তই কিছু কিছু জানেন। কলিকাতা, হাওড়া থাকাকালীন এতজোরে হুঁংকার দিতেন যে চিত্তরঞ্জন রেলকার-খানার বিদ্যুৎ বন্ধ হইয়া যাইত। পরে কর্ম্মকর্ত্তারা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইলে জোরে হুঁংকার করিতেন না। অনেকেই তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

১৯৭৭ সালের উৎসবের দিন ভোরবেলা সমস্ত আকাশ কালো মেঘে

ছাইয়া গেল। মারাত্মক ঝড়ের আশংকায় সকলেই ভীত হইলেন। ঠাকুর বাহিরে আসিয়া হাত তুলিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলেন কিছুক্ষণ এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন তোমাদের ভয়ের কারণ নাই। এইঝড় বৃষ্টি অন্যদিকে এখনই চলিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্র উঠিয়া গেল।

সেবিকা গুরুদাসীর কাছে শুনিলাম এক আশ্চর্য্য ঘটনা। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য সপরিবারে আরবদেশে কর্ম্মরত। ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য কলিকাতা চলিয়া যায়। ঠাকুর তখন ও স্থূলদেহে আছেন। হঠাৎ একদিন বলেন, "নাতনী, কৃষ্ণকে নিষেধকর আরবে যেন না যায়। ওখানে যুদ্ধ হইবে। গেলে তাদের খুব কষ্ট হইবে"। জানাইয়া দেওয়া সত্বেও কৃষ্ণ চলিয়া যায় কিন্তু লণ্ডনে আট্‌কা পড়ে। তারপরে কোন রকমে তো পৌঁছিল আরবের রিয়াধে। ইরাক ইরানের যুদ্ধ শুরু হইল। এত গোলাবারুদ-এর মধ্যেই তাহারা অক্ষত রহিল একমাত্র গুরু কৃপায়। তাহার বাড়ীর চারিদিকে বোমাবর্ষণ হয় কিন্তু তাহার বাড়ীতে একটিও পড়ে নাই। এই বিপদে গুরুদেবের নিষেধের কথা মনে পড়িল এবং গুরুকে স্মরণ করিতে লাগিল। যুদ্ধের পরে যখন ভারত আসিল তখন এই বিভীষিকা-ময় যুদ্ধের কাহিনী শুনাইল এবং গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া প্রকাশ করিল।

আমার ভাগিনা শ্রীমান অভিজিৎ গোস্বামী (আশীষ) তাহার বন্ধুও পাড়ার ছেলেদের নিয়া প্রায়ই ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইত। ঠাকুরের মহা-সমাধির আগের রাত্রেও তাহারা কীর্ত্তন শুনাইয়াছে। কীর্ত্তনের শেষে ঠাকুরের নির্দ্দেশ তাঁহাকে পাশ ফিরাইয়া দিতে গিয়া পরশমণির স্পর্শ সুখ লাভ করিয়া ধন্য হইল। পরের দিন আবার আসিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইবার কথা বলিলে সে জানাইল যে তাহার কলেজে পরীক্ষা আছে। ঠাকুর আবার বলিলেন সে আসিতে না পারিলে তাহার প্রতিনিধি যেন পাঠায়।

ঠাকুরের দেহত্যাগের খবর পাইয়া আশীষ করিমগঞ্জ হইতে বিকালবেলা

গ্রামে চলিয়া আসে এবং কীর্ত্তন করিয়া ঠাকুরকে সমাধিস্থলে লইয়া যায়। কিছুদিন পর ঠাকুর স্বপ্নে তাহাকে অনেক কথা বলেন। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা আশীষ, আনন্দ, মন্টাই, অজয়, শংকর, ঠাকুরের নাতি রমু, সুজিৎ ছোট, সীতু, ছবি, অনন্ত, রাখী, চম্পু ও রিম্পু ও মণি প্রভৃতি সর্ব্বদা ঠাকুরকে কীর্ত্তন শুনাইয়া ঠাকুরের প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া বাড়ী ফিরিত। আমার ছেলেমেয়েরাও কীর্ত্তন শুনাইত। আমার ছোটভাই কুশী ঠাকুরের কৃপায় খোল বাজাইয়া সুন্দর কীর্ত্তন ও মঙ্গলারতি ঠাকুরকে শুনাইত। ঠাকুর আশীষকেও বলিতেন "দশকুশী তালে জয়গুরু মহানাম কীর্ত্তন করবি। ইহাতে অনর্থ নিবৃত্তি হয় জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দেশ ও দশের মঙ্গল হয়"। আমার এই তরুণ কীর্ত্তনীয়া দল ঠাকুরের সব উৎসব পালন করিত এবং আজও করিয়া যাইতেছে। এদের অবশ্যই মঙ্গল হইবে।

শ্রীসনৎকুমার দেব, প্রাথমিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, ঠাকুরের শিষ্য না হইলেও ভক্ত এবং কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। বাড়ী রাণীবাড়ীতে। ঠাকুর বলিতেন, "সনৎমাষ্টার সজ্জন। তাহাকে তোমরা সম্মান করিও"। সনৎমাষ্টার ঠাকুরের সব উৎসবে খুব নিষ্ঠার সহিত সহযোগিতা করিতেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ সালে সজ্ঞানে সাধনোচিতধামে গমন করেন। মাকরী সংক্রান্তি হইতে তিনদিন যজ্ঞানুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। অষ্টমী তিথিতে খুব অসুস্থ খবর পাইয়া দেখিতে গেলাম। মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া ইষ্টনাম জপ করিয়া দিলাম এবং গুরুস্তোত্র গান করিলাম। মাষ্টার মহাশয় আমাকে জানাইলেন, "ঠাকুর তাহাকে দর্শন দিয়াছেন এবং সেইদিন হইতে আজ্ঞাচক্রে কেবল জ্যোতি দর্শন করিতেছেন। তিনি যেন সত্বর পরপারে যাইতে পারেন সেই প্রার্থনাও করিতে বলেন। পরেরদিন ভোরবেলা যজ্ঞের প্রসাদ চাহিলে পাঠাইয়া দিলাম এবং খুব তৃপ্তিতে গ্রহণ করিলেন। দুইদিন পর দেহত্যাগ করেন।

ঠাকুর যে জগদ্‌গুরু ইহার অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে। দীক্ষিত নয় এমন বহুভক্ত তাঁহার দর্শন ও কৃপলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। করিমগঞ্জের কায়স্থগ্রাম নিবাসী শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য্য স্বামী

স্বরূপানন্দের দীক্ষিতা, পরম ভক্তিমতি ও পরমার্থ সাধিকা। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী জ্যোৎস্নারাণীর ছোট জা হিসাবে আমারও ভগ্নী। ঠাকুরের তিরোভাবের পরে তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে বলিল, "আপনার গুরুদেবের সঙ্গে প্রায়ই স্বপ্নে আমার সাক্ষাৎ হয়, কথাও হয়। মহান গুরু আপনার। আমার ও আপনার গুরু অভিন্ন। ইনি শরীর ছাড়িয়াছেন আমি যেন ভাবতেই পারি না"।

আমার ছোটবোন জ্যোৎস্না এক তান্ত্রিক গুরুর দীক্ষিতা হইলেও ঠাকুরের কৃপালাভ করে। ঠাকুর তাহাকেও স্নেহ করিতেন। তাহার অকাল বিয়োগে আমরা দুঃখিত হইলেও একটা আনন্দ হইল এই যে অন্তিম সময়ে আমিও আমার ছোটভাই আহুতি করিয়া তাহাকে প্রসাদ দিলাম। তাহার দেহত্যাগের রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে আমি ঠাকুরের কাছে যাওয়ার সময় পথে নজরে পড়িল চিতা জ্বলিতেছে এবং আমি সেই চিতায় তিনটি আহুতি দিয়া ঠাকুরের কাছে চলিয়া যাই। ঠাকুরকে ঘটনা বলিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন ভাল করেছিস্। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনদিন পরে খবর পাইলাম বোন চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত করুণা চক্রবর্ত্তী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কবি, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য যদিও তিনি আবার রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নেন। তাঁহার বাল্যকালের কিছু ঘটনা গুরুদেব সম্পর্কে বলিলেন। গ্রামে প্রথম রেডিও শুনিয়া সকলে অবাক হইলে গুরুদেব বলিলেন, "অবাক হওয়ার কি আছে? রেডিও এইদেহেই আছে এবং ইহার ক্রিয়া চলিতেছে অনবরত। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, দূরে থাকিয়া কথা বলা ইত্যাদি সিদ্ধপুরুষের নিত্যকার ব্যাপার। ভবিষ্যতে কত আবিষ্কার তোমরা দেখিবে।

তাঁহার গার্হস্থ্যলীলায় একবার পরিবারের সদস্যরা অতিষ্ঠ হইয়া পুলিশের সাহায্য নিলেন পাগল ভাবিয়া। দারোগা পুলিশ আসিয়া তাঁহাকে নিয়া গেল এবং একরাত হাজতে রাখিল। পাগলের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া দারোগার চোখ খুলিয়া গেল। বহুজন্মের সু-তপস্যার ফলে দারোগা এমন এক পাগলকে বন্দী করিতে গিয়া নিজেই ভক্তিডোরে বন্দী হইয়া গেলেন। পরেরদিন দারোগা নববস্ত্র পরাইয়া সসম্মানে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া

দিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় প্রণাম করিয়া বলিয়া গেলেন এই প্রেমের পাগলকে কয়েদ করাতেই তাহার হৃদয়ের বদ্ধদুয়ার খুলিয়া গেল। ইনি আসল পাগল ভোলা মহেশ্বর।

এক মুসলমান পীরের সঙ্গে তাঁহার খুব ভাব ছিল। বেশ কিছুদিন মোকামে যাইতে পারেন নাই। পীরসাহেব একদিন ব্যস্ত হইয়া আসেন রমেশকে দেখার জন্য! "ভাই রমেশ তোরে কতদিন দেখি নাই" আওয়াজ শুনিয়া রমেশ ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া কোলাকুলি করেন। তারপর পীরসাহেব ও রমেশ আল্লা ও নারায়ণের দোহাই দিয়া পৃথিবীর মানুষের দুঃখ কষ্ট দূরীকরণের ব্যাপারে আলোচনা করেন। পীরসাহেব কিছু খই ও কলা রমেশের জন্য আনিয়াছিলেন তাহা হাতে দিলেন। রমেশ নারায়ণের জন্য কিছু রাখিয়া বাকী খই ও কলা একই পাত্র হইতে দুইজনে বসিয়া গ্রহণ করিলেন। পীর ও সাধুর জাত, ধর্ম্ম এক, এই শিক্ষার জন্যই এই লীলা।

একদিন বিদ্যা-স্ত্রী ও অবিদ্যা-স্ত্রী কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিলেন ঠাকুর। বিদ্যা স্ত্রীকে নিয়া ধর্ম্মসাধনে যেরূপ সাহায্য হয়, অবিদ্যা স্ত্রীকে নিয়া তেমন হয়না। সহধর্ম্মিণী সকল স্ত্রী হইতে পারে না। প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিণী বিদ্যা স্ত্রীর গুণসম্পন্না।

তিনি উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু বড় পণ্ডিতরা তাঁহার উচ্চকণ্ঠে চণ্ডীপাঠ, ভৈরবস্তোত্র, শিবস্তোত্র, মহিম্নস্তোত্র-এর উচ্চারণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। ইনি সাধারণ মানুষ নন, এই জ্ঞান অনেকেরই ছিল। প্রচার বিমুখ ছিলেন বলিয়া আজও জগতে অজ্ঞাত।

ঠাকুরের মধ্যমভ্রাতা শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী ৮৪ বৎসর বয়সে ১৯৮৫ ইংরাজীতে দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মহাপুরুষ ভাবিলেও তেমন একটা পাত্তা দিতেন না। গীতায় বিরূপ মন্তব্য করায় আমি রাগ করিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে চলিয়া আসি এবং অন্তিম শয্যায় শেষবারের মত বৃদ্ধকে দেখিতে গেলাম। কয়েকটা কমলালেবু ও আপেল নিয়া যাই সঙ্গে। বৃদ্ধ চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। আমি কাছে যাইয়া ডাকিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন. "ভাই তুই আমার জন্য কমলালেবু ও আপেল নিয়া আসিয়াছিস্ নাকি ? কেন বলুন তো ? এইমাত্র একজন

মহাত্মা যে বলিয়া গেলেন। আমি তো অবাক। দেখাইলাম তাঁহাকে কমলা ও আপেল। তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ছিলেন রে ঐ মহাত্মা? আর কে দাদুভাই গুরুদেব? তুই ঠিক বলেছিস্। আমাকে কমলা ও আপেল আহুতি দিয়া তোর নিজের হাতে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়া দিলে খাইব।" তাই করিলাম। সবটাই খাইলেন এবং দুই চোখে ধারাও অক্ষুণ্ণ আছে। এই তো শেষ খাওয়া মহাপ্রসাদ। ভাই, আমাকে গীতা শুনাবি। জীবনে অনেক ভুল করিয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্য কম করি নাই। তুই আমাকে একটু শান্তি দিয়া যা" গীতা শুনিয়া বিদায় নিয়া গেলাম ঠাকুরের কাছে। যাইতেই বলেন, "আমার জন্য কি এনেছিস্? আমার হাতে দে।" কমলালেবু ও আপেল দিলাম। আপনার ভাইকে শেষবারের মত খাওয়াইলাম আহুতির প্রসাদ। খুব ভাল কাজ করলি কিন্তু। আমার তো শক্তি নাই যে যাইয়া দেখিব। রমণী কেমন আছে রে? এখন অনেক আনন্দে আছে বুঝিলাম। চলিয়া যাইবেন আজ গীতা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শুনাইয়া আসিয়াছি। এই সবই তো আপনার গোপন। কে ছিলেন সেই বৃদ্ধ মহাত্মা? এইরূপে দর্শন দিলে আপত্তি কি ছিল? জবাব দিলেন না।

হনুমানের ভক্তি কিরকম ছিল?

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥

"এর মানে কি বুঝসি? বুঝি বলিয়াই তো শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে আছি। সংসারের ঝামেলায় বিষয়চিন্তায় কত সময় নষ্ট হইয়া যায়। গুরুকর্ম্ম করার সময় কোথায়? কেবলই তো যোগ বিঘ্ন ঘটে। এক এক সময় মরিতে ইচ্ছা করে। জীবনে বোধহয় কিছু হইবে না।" সে কিরে? তোদের মত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই রকমের কথা শোভা পায় না। সংসারটা তো ভগবানের। যদি গুরুপদে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিস্ তবে এই সংসার তোর কি করিয়া হয়? সংসার অবশ্যই করবি গুরুর কর্ম্ম মনে করিয়া। ভগবৎ সেবাজ্ঞানে। তবে আর ঝামেলা নাই। যখন যেমন, তখন তেমন। মনটা গুরুতে থাকিলেই আর চিন্তা নাই।

গুরু যদি জগৎচিন্তামণি হন, তবে তুইও জগতের একজন। গুরু সকলের চিন্তা করেন। সিদ্ধমহাপুরুষরাও কর্ম্ম করেন জগতের জন্য। তোদের প্রথম সকাম কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলেই নিষ্কাম কর্ম্ম শুরু হইবে।

প্রায়ই বলিতে শুনা যায় গুরুকৃপা। গুরুকৃপা তো লাগিয়াই আছে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ যত বেশী ঘনিষ্ঠ হইবে, কৃপা ততই অনুভূত হইবে। আমার পরিবারের এক সদস্যা বলেন, "বেশী গুরু গুরু কর, ধর্ম্ম কর বলিয়াই এত অশান্তি জীবনে। মানুষ কত আরামে, আনন্দে, ঘরবাড়ী সম্পত্তি লইয়া সুখে দিন কাটাইতেছে। কথায় আছে নাকি, 'যে করে পাপ সে হয় সাত পুতের বাপ।' আমার জবাব, তুমি আরেকটি কথা ভুলিয়া গিয়াছ? "যে করে আমার আশ তার হই সর্ব্বনাশ। তবে যে করে আমার আশ, তার হই দাসের দাস।"

এই কথাটা আমার মায়ের মুখে প্রায়ই শুনিতাম। যোগশাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া পরবর্তী কালে বুঝিলাম "সর্ব্বনাশ" কথাটির অর্থ। চঞ্চল প্রাণ মনের নাশ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত যোগ কোথায়? আনন্দ তো আমরা চাই না। আমরা চাই স্থায়ী পরমানন্দ সচ্চিদানন্দকে, যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ হইয়াও অপূর্ণ লীলাজগতে আমাদের অভাবে ভক্তের অভাবে। মায়াবদ্ধ জীবের উদ্দেশ্যে গীতায় বিভিন্ন শ্লোকে বারবার ভগবান বলিতেছেন :—

"তেযামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥

কিংবা

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপ যান্তি তে॥

আবার বলিতেছেন :—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তিতে॥

ভক্তের যেমন ভগবানকে চাই, ভগবানেরও তেমনি ভক্তকে চাই।

তাইতো নরদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে হয় ভক্তের খোঁজে। ভগবান ব্যতীত ভক্তকে অমৃত পান কে করাইবে? কে শিক্ষা দীক্ষা দান করিয়া ভোগের মাধ্যমে কর্মক্ষয়ে মহাযোগের মহারথে আরোহণ করাইয়া আনন্দলোকে মহারাসের মহামঞ্চে অনন্তকালের জন্য আশ্রয় দিবে? এই ভাবনায় ভক্তকণ্ঠ গাহিয়া উঠিল: -

কে রেখেছে ঠাকুর তোমার
ভক্ত সখা নাম,
তুমি দয়াল বলে দীনবন্ধু
গুরুকৃষ্ণ রাম ॥
লীলা কভু হয়না একা
তাই বলে চাই প্রাণ সখা,
সখ্য প্রেমের পরিণামে
মধুর রসে পূর্ণকাম ॥
তোমাতে যার জাগে সে ভাব
সে ও তোমার কৃপার প্রভাব,
পঞ্চভাবের আস্বাদনে
ভক্তের পুরে মনস্কাম ॥
যুগে যুগে ভক্ত পার্ষদ
লাভ করিয়া ভক্তি সম্পদ,
প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে,
দেহান্তে পায় নিত্যধাম ॥

কলিকাতার গুরুভগ্নী শ্রীযুক্তা হেনা দাস আমাদের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে গেলেন নভেম্বর ১৯৯৪ সালে। একদিন কাশীতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা দিদি, আপনি তো অনেকবার ঠাকুরের সেবার সুযোগ পেয়েছেন, আমিও দেখেছি দু'বার আপনার সেবানিষ্ঠা। এমন কিছু ঘটনা আপনার জীবনে আছে কি যা প্রকাশ করিলে লোক গুরুমহিমা জানতে পারে এবং আনন্দ লাভ করতে পারে"? জবাব দিলেন, "আছে বৈ কি? কত ছোটখাট ঘটনা সব তো মনে নেই, তবে দুটো ঘটনা বললেই

বাবার শ্রেষ্ঠত্ব লোকে জানতে পারে। আমি তিনমাস পায়ের ব্যথায় বিছানায় ছিলাম। বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে। পায়ের অপারেশন করাতেই হবে। মৃত্যু না হলেও পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন। আমার স্বামী এক গুরু ভাইএর সঙ্গে ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। ঠাকুর বললেন, মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অপারেশন লাগবে না। আমাকে ধরাধরি করে বাবার কাছে নিয়াগেলে বাবা আমার কানে দীক্ষা দিয়ে বললেন, বাড়ীতে নিয়ে যাও। কিছু-দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। ১৯৮২ ইংরাজীতে বাবা যখন রাণীবাড়ী আশ্রমে চলে গেলেন, খবর পেয়ে আমাদের কি দুঃখ। আমার ছেলে সুব্রত একেবারে বালক। কিন্তু সে প্রায়ই মূর্তিদর্শন করত এবং বলত কখন দেখে মহাপ্রভুকে ফটোতে যেমন দেখা যায় আবার কখন বাবাকে। সে নাকি দৈববাণী শুনল একদিন যিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তিনিই আমাদের গুরু মৌনীবাবা। তার কথায় আমরা কেউ বিশ্বাস করতাম না।

তারপর কিছুদিন আমাদের ঘরে এক অলৌকিক কাণ্ড শুরু হইল। প্রতিবেশীরা বা অনেকেই বলত ভৌতিক। আমরা তো ভয় পেয়ে গেলাম। গুরুদেব রাণীবাড়ীতে। কাকে জিজ্ঞেস করব ? দরজা জানালা রাত্রে বন্ধ থাকে। ঘরের মধ্যে চার পাঁচখানা ভাঁজ করা টাটকা রুটী রোজই পাওয়া যাইত। কে রেখে যায় ? কখনো কয়েকটা গোলাপফুল, কখন পদ্মফুল পাওয়া যাইত। সকলেই বলে ভৌতিক ব্যাপার। এক-রাত্রে এক গোপালমূর্তি এবং ছোট রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পাওয়া গেল। স্বপ্নাদেশ হল এমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রোজ সেবা পূজো করবি। তোদের ভাল হবে। সেই মূর্তির পূজা আজও আমরা করে যাচ্ছি। অন্যসব রকমের উৎপাত যেমন রুটি, ফুল ঘরে ছড়ানো বন্ধ হয়ে গেল মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

আমরা সাধারণ মানুষ কি বুঝি ? যখন বাবার একটু পরিচয় পেলাম তখন তো তিনি নাগালের বাইরে। যদ্দিন সংসারে বেঁচে আছি তাঁর নাম করে যাব। একটু আশীর্বাদ করবেন দাদা মরবার কালে যেন

যেন ঠাকুরের দর্শন পাই এবং তাঁর শ্রীচরণে একটু স্থান পাই।

বৃদ্ধা বলিয়া গেলেন এবং আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া গেলাম। কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিরূপ গুরুভক্তি চিন্তা করা যায় না।

১৯৮৪ সালে আমার ভাই কুশীর প্রথমা পত্নী শ্রীমতী গৌরীদেবী পরলোক গমন করিলে দুইবৎসরের মধ্যে ২য় বার দার পরিগ্রহ না করার জন্য গুরুদেব বলিয়াছিলেন। এইদিকে ছোট শিশু মুক্তিকে দেখাশুনার জন্য সকলের উপদেশে দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী লীলাকে ঘরে আনিতে হইল। লীলাকেও ঠাকুর দীক্ষা দিলেন। লীলা বোধহয় ঠাকুরের চরণে চিরআশ্রয় লাভের জন্যই এই পরিবারের বউ হইয়া আসে এবং দুই বৎসরের মধ্যেই একটি ছেলে সন্তানের আশায় কন্যা সন্তান প্রসব করিয়া মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়া চিরবাঞ্ছিত ধামে চলিয়া যায়। ঠাকুর বলিলেন, "আমার আপত্তি কেউ গ্রাহ্য করিল না। আমি কি করিব? যাই হউক প্রভুর ইচ্ছায় তাহার কর্ম্ম তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যাওয়ায় চলিয়া গিয়াছে। ভালই তো হইল"। তাহার স্মৃতিরক্ষার্থে শিশুর নাম রাখা হয় 'স্মৃতি'।

শ্রীমান কুশীর স্ত্রী ও তাহার মেয়েরা গ্রামের বাড়ীতে থাকিত। তাহার একমাত্র ভরসা শ্রীগুরু পাদুকা। এই পাদুকার জোরে ঘরে চোর ঢুকিয়া সব জিনিষ বাহির করিয়াও নিয়া গেলনা, অথচ সকলে ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখে দরজা জানালা সব খোলা এবং ঘরের যাবতীয় জিনিষপত্র বাহিরে ছড়ানো। সকলের একই প্রশ্ন এই ধরণের চুরির ঘটনা আজ পর্য্যন্ত কেউ শুনে নাই। চোর কে তবে বাধা দিল কে? ঘরের মালিক এক মেয়েলোক ও তিনটি ছোট শিশুতো ঘুমে কাতর ছিল।

ঠাকুরকে মহাসমাধির কয়েকদিন পূর্বেও জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁহার কোন প্রচার নাই, আশ্রম ও নাই। ভক্তদের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়াছি। অনেক গুরুত্যাগ করিয়া রাতারাতি ভগবানের দরবারে পৌঁছার জন্য অনেক নাম করা গুরু ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের বিমানে আরোহন করিয়াছে। এই বিমান আকাশে উড়িতে থাকিবে যতক্ষণ তৈল থাকিবে এবং তারপর ইঞ্জিন কোথায় নিয়া যাইবে ভগবানই

জানেন। প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যুর আগে তোরা কিছুই করিতে পারিবেনা। তারপরে করবি। বৈষ্ণবধাম ও তীর্থগুলিকে জাগাইতে হইবে। সম্ভব হলে তোরা ধরমশালা করে নিবি একটা। এক একজন সেবায়েৎ নিযুক্ত করবি। ভক্তরা তীর্থদর্শনে গেলে এখানে থাকবে। খাওয়ার ব্যবস্থা না হয় হোটেলে করে নেবে। জীবনী গ্রন্থ তুই লিখে প্রকাশ করবি। আশ্রম সম্ভব হলে করবি। তোরা যেখানে থাক্‌বি সেটাই তো আমার আশ্রম। আমাকে নিয়াই তো তোরা থাক্‌বি। তবে আবার কি? টাকা পয়সা কোন সমস্যা নয়। ভক্তরা ইচ্ছা করলে সাহায্য করতে পারে। আশ্রম হয়ে যাবে। তোরা আগে মানুষ হয়ে যা গুরুভাইকে কখনও ছোট ভাববি না। সব ছেলেই বাপের কাছে সমান এবং সম্পত্তির সমান ভাগ পায়। যার বুদ্ধি আছে বাড়ায়, যার নাই নষ্ট করে। এখানে তো বাপের দোষ নাই। তবে গুরুর শক্তি যে রক্ষা করিতে পারিবে, গুরু তাহাকেই দায়িত্ব দিয়া যান।

তোমার এ ভৃত্য আজ
তোমারি আদেশে নাথ
জনহিত কর্ম্মযজ্ঞে
বাড়ায়েছে হাত ॥

নাই সংশয় ভয়
গুরুর হাতে বরাভয়
অহেতুক কৃপা যবে
রহিয়াছে সাথ ॥

প্রচারে আপত্তির ফলে
রহিলে অজানা,
অপ্রকটে লীলাময়
করিও না মানা।

জীব জগতের বন্ধু
অহেতুক কৃপা সিন্ধু,
মৌনীবাবা যোগীশ্বর
সচ্চিদানন্দ নাথ ॥

তন্ত্রযোগ প্রেমভক্তি
কঠোর তপস্যায়,
কর্ম্মই জীবের ধর্ম্ম
জীবন সাধনায় ॥
এ জগৎ ব্রহ্মময়
ঈশ্বর ভিন্ন নয়
জাগাও চৈতন্য জীবে
গুরু জগন্নাথ ॥

— x —

তুমি কি করবে ভবে
করাবে কি জানি না
ভাবি যাহা করি যাহা
পেয়ে অনুপ্রেরণা ॥
স্থূলে আজ যদি বা নাই
আছ সাথে বুঝিতে পাই
যাব করে ধর্ম্ম তোমার
ভুলে সকল যাতনা ॥
অবেলায় ভাঙ্গিয়া খেলা
বাড়ালে পরাণে জ্বালা
গুরু ব্রহ্মোর নিত্যলীলা
হৃদয়ে জাগাও দোলা ।
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যেমন
সংসারে চলবে তেমন
অন্তরে থাকে যেন
সবই গুরুর করুণা ॥

লীলাময় গুরুদেব তাঁহার গোপনলীলা সমাপন করিয়া আমাদের সামনে এক প্রশ্ন রাখিয়া গেলেন, যাহার জবাব আমাদের কর্ম্মের মাধ্যমেই দিয়া যাইতে হইবে। আমাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে আমরা শিষ্য হইতে

পারিয়াছি কি ? যদি না হইয়া থাকি তবে আগে শিষ্যত্বের সাধন করিয়া নিজেকে গুরুদাসে পরিণত করিতে হইবে। আপন হৃদয়ে গুরুর প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করিতে হইবে। "যুগধর্ম্ম মানবতার" যে আদর্শ ঠাকুর দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাকে জীবন্ত রূপ দিতে হইবে। তবেই সমাজের কল্যাণ সম্ভব।

জীবের সেবা করিলেই ভগবৎ সেবা হয়। নিঃস্বার্থ সেবক হইলে নিজের যশ, স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা, পরশ্রীকাতরতা হিংসা, অহংকার ও অন্যের দোষ দর্শন প্রভৃতি বর্জন করিতে হইবে। কিছু পাওয়ার লোভে অন্যের উপকারের অভিনয় করিবে না। সমাজ সেবাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে খাঁটি নিষ্কাম কর্ম্মী হইতে হইবে। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লোকচক্ষে ধূলা দিয়া সেবক সাজিতে যাইও না। সেবাই তোমার ধর্ম্ম। ভগবান যদি দয়া করিয়া তোমাকে কখনও সেবার সুযোগ দেন, তবে পরম নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইবে। ইহাতে তোমার এবং তোমার বংশধরদের ও মঙ্গল হইবে। অসদুপায়ে উপার্জ্জন ও ধনসঞ্চয় আজ লাভদায়ক বলিয়া মনে হইলেও তাহা কিরূপ ক্ষতিকারক কল্পনা করিতে পারিবে না। ইহার দ্বারা যেমন আত্মক্ষয় হইতেছে, তেমনি বংশ পরাম্পরায় সেই পাপের বীজ ছড়াইয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া যাইবে।

দয়াল ঠাকুর সেইজন্য বারবার বলিতেছেন, ধর্ম্মরক্ষা করিয়া জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কম হইলেও আত্মার শান্তি অক্ষুন্ন থাকিবে এবং পরকালে চিরসুখ লাভ হইবে সকলের মিতব্যায়ী হওয়া দরকার। কোন দ্রব্যের অপচয় ঠাকুর সহ্য করিতে পারিতেন না। সংসারে অভাব অভিযোগ নিজের দোষেই হয়। সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা দরকার। অভাব নিজের সৃষ্টি সুখ মওতায়। স্বাচ্ছান্দ্য ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র্য আপন আপন কর্ম্মফল অনুযায়ী। রাতারাতি ভাগ্য পরিবর্তন করিতে যাইয়া সত্য ধর্ম বিসর্জ্জন দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিবে, তাহাতে দগ্ধ হইয়া জন্ম—জন্মান্তরে কষ্ট ভোগ করিয়াই যাইতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে শুনা যায়, আজ তো ভোগ করিয়া লই, মৃত্যুর পরে কি হইবে আমি তো বুঝিব না। কেন বুঝিবে না ? তুমি তো এই নশ্বর দেহপিণ্ড নও। তুমি

অমর আত্মা। জন্মান্তরে বিশ্বাস অবশ্যই করিতে হয়। যাহাদের কিঞ্চিৎ শুভ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, পরমার্থ পথে চলিতে ইচ্ছুক, তাহারা যেন এই জাতীয় অশুভ যুক্তিতে বিশ্বাস না করে।

যে সকল মহাপুরুষ ও সিদ্ধ মহাত্মার প্রচার প্রতিষ্ঠা নাই। তাঁহাদের অবদান সমাজ মানুষের জন্য কতখানি এই নিয়া কয়েকজন আধুনিক শিক্ষিত ও পেশাধারী ধর্ম্মার্থীর সঙ্গে আমার বেশ বাক্ বিতণ্ডা চলে। সমাজে বাস করিয়া প্রচার কৌশলও কিছু বিভূতির মাধ্যমে যাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যথেচ্ছ সুখ সাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া যাইতেছেন, তাহারাই লোক হিতৈষীও জন সমাজের উদ্ধার কর্ত্তা রূপে স্বীকৃতি পাইয়া যাইতেছেন। অথচ অজ্ঞরা জানে না যে হিমালয়ের গুহায় নিভৃতে যাঁহারা বাস করেন কিংবা লোকালয়ে ছদ্মবেশে যে সকল মহাপুরুষও সিদ্ধ পুরুষ বিচরণ করেন তাঁহাদের লক্ষ্য, কর্ম্ম, এবংচিন্তা, ভাবনা সর্ব্বপ্রাণী তথা মানব জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান করা।

আমার গুরু মৌনীবাবার অবদান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিলে জবাবে বলিলাম, তিনি প্রতিষ্ঠাও প্রচার বিরোধী ছিলেন। স্বয়ং শিবস্বরূপ অষ্টসিদ্ধি যাঁহার করতলগত। মহাশক্তিধর যোগীশ্বর ও মানব প্রেমিক হইয়াও অতি সাধারণের মত থাকিয়া সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করিয়া অনুন্নত, এবং দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন ও আত্মোন্নতির জন্য জীবনভর প্রয়াস চালাইয়া গিয়াছেন। আগাছার পরিবর্ত্তে বাগানে বেশ কিছু চন্দন, দেবদারু লাগাইয়া গিয়াছেন যাহার মাহাত্ম একটু দেরীতে অনুভূত হইবে। বর্ত্তমানে যুগধর্ম্ম মানবতার বীজ সর্ব্বত্র বপন করিয়া গিয়াছেন যাহাতে সনাতন ধর্ম্ম তথা আর্য্য কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। শান্ত মুর্ত্তি ও প্রাণ পুরুষ মৌনীবাবার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত পাঠ করিয়া ভাগ্যবান ও শান্তিকামী পাঠক ও পরমার্থ পথিকরা সত্যালোকের সন্ধান পাইবেন বলিয়া আশা রাখি।

প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবার অমৃত কথা আমার জীবনের অভিজ্ঞতাও কয়েকজন ভক্তের জীবনে ঠাকুরের অহেতুক করুণার উপর নির্ভর করিয়াই এই ভক্তি অর্ঘ্য শ্রীগুরুচরণে অর্পন করিলাম।

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

উপাসনা সংগীত

(১)

বন্দে সদ্‌গুরু রমেশচন্দ্র পদার বিন্দদ্বয়ম্ ।
বন্দে মৌনীবাবা সচ্চিদানন্দ নাথ বিগ্রহম্ ॥
বন্দে মহাযোগী ঋষিকূল গৌরবম্
পতিত পাবন গুরুভক্ত বৎসলম্ ॥
বন্দে ভবভয় দারিদ্র্য দুঃখ বিনাশকম্
সংসার বন্দনাৎ মুক্তি প্রেমভক্তি প্রদায়কম্ ॥
বন্দে কুলাবধূতং পরমশিব স্বরূপকম্ ।
দীনবন্ধু জগন্নাথং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥

(২)

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু জয় জয় ।
জয়গুরু সদ্‌গুরু জয়গুরু জয় জয় ॥
জয় জয় মৌনীবাবা জয়গুরু জয়জয় ।
সদ্‌গুরু শ্রীরমেশচন্দ্র জগদ্‌গুরু জয় জয় ॥
সুন্দর অনুপম নবরূপধারী ।
আনন্দ মূরতী হরি বৈকুণ্ঠ বিহারী ॥
একাধারে যোগীঋষি ব্রহ্মাবিষ্ণু শিব ।
পরব্রহ্ম পরাৎপর পরম বৈষ্ণব ॥
পতিত পাবন গুরু ভবভয় ত্রাতা ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বরাভয় দাতা ॥
অনন্ত মহিমা যেমন অনন্ত আকাশ ।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভুবনে প্রকাশ ॥
স্বরূপে করহ স্থিতি হৃদি পদ্মাসনে ।
ধন্যকর অকিঞ্চনে প্রেমভক্তি ধনে ॥

(৩)

শ্রীশ্রীমৌনীবাবার আরতি

শিবগুরু মৌনীবাবার আরতি বলি
সুমধুর ধ্বনি বাজে খোল করতালি ॥
শঙ্খ কাঁসর ঘণ্টা নাম সংকীর্ত্তনে।
নাচে গায় প্রেমানন্দে ভক্তগণে ॥
সুখাসনে দিব্যমূর্তি গলে দোলে মালা।
অধরে মধুর হাসি বদন উজ্জ্বলা ॥
গুরুপ্রিয়া গুরুদাসী যত সহচরী।
প্রেমানন্দে ভাসে প্রভুর আরতি হেরী ॥
শ্রীগুরুপদে আশ করে গুরুদাসে।
ধন্যমানে জগদ্‌গুরুর মহিমা প্রকাশে ॥

— × —

(৪)

জয় শিব শঙ্কর মহাযোগেশ্বর।
জয়গুরু সচ্চিদানন্দ নাথ ॥
কৈলাসে ভবানীপতি
সর্ব্বজীবের গতি,
জয় জগন্নাথ ॥
আদি অন্ত নাই বলে
অনাদি অনন্ত,
বিল্বপত্র গঙ্গাজলে
শিলা প্রাণবন্ত।
আত্মমায়া বলে শিব
হলে ভবে বহুজীব,
কে বুঝে তোমার লীলা
হে ভোলানাথ।

— × —

(৫)

জয়গুরু সচ্চিদানন্দ নাথ
পরমপুরুষ জয় জগন্নাথ ॥
মায়াবদ্ধ কলিজীবের মুক্তিদাতা
পতিত পাবন ভবভয় ত্রাতা,
অহেতুক কৃপাসিন্ধু আর্ত্তদীনবন্ধু,
প্রেমকল্প তরু শ্রীগুরু নাম ॥
ব্রহ্মবেত্তা যোগেশ্বর মহামহেশ্বর
মৌনীবাবা লীলাময় প্রাণের ঈশ্বর,
গোপনে ভুবনে আসি, বাজায়ে ব্রজের বাঁশী.
ভক্তের জীবন ধন্য করিলে হে নাথ ॥

— x —

(৬)

সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ হে ভগবান
চরণসরোজে তব করি গো প্রণাম ॥

আঁধার হৃদয়ে মোর জ্বেলে জ্ঞান দীপ
জাগালে পূরব স্মৃতি গৌর নবদ্বীপ,
মানস যমুনা তীরে ভ্রমি বন উপবনে
কবে পাব বৃন্দাবন শ্রীরাধিকা শ্যাম ॥

পরমপুরুষ গুরু ব্রহ্ম সনাতন
চরণ আশ্রয়ে মোর শান্তি নিকেতন,
চাহি না যশের মালা জুড়াও প্রাণের জ্বালা
জাগচিত্তে স্বরূপেতে তারক ব্রহ্মনাম ॥

— x —

(৭)

ভজরে অমৃত নাম
মৌনীবাবার নাম,
মঙ্গল দায়ক মহানাম
জয়তু সচ্চিদানন্দ জয় জগন্নাথ ॥

হঠ রাজ যোগেশ্বর তপস্বী প্রবর
কালী তারা সিদ্ধ মহাশক্তি ধর,
প্রেম ভক্তি সিন্ধু আর্ত্ত দীনবন্ধু
লোকগুরু সচ্চিদানন্দ নাথ ॥

অধরে মধুর হাসি
ঘুচায় দুঃখ রাশি,
অহেতুক কৃপা জীবে
ভালবাসি ।

স্বরূপে মহেশ্বর যুগ ধর্ম রক্ষক
পরমার্থসাধকে পথ প্রদর্শক,
স্মরণে কীর্ত্তনে নাম পূরে মনস্কাম
মৌনীবাবা ত্রিলোকের নাথ॥

— x –

(৮

জয় গুরু শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু
অবধূত ভুবনে প্রকাশ,
সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ নররূপে শ্রীগোবিন্দ
পূরাইতে ভক্ত অভিলাষ॥

মোরা অজ্ঞ হীনমতি দাও গুরু পদে রতি
হৃদয় আসনে কর বাস।
জর্ম্মার্জিত তমঃ রাশি নিজগুণে কর আসি
ভক্তি প্রদীপ জ্বালি নাশ ॥

যুগল ভজন ধন করি গেলে বিতরণ
না শুনিল চঞ্চল মন।
এবে অশ্রু বরিষণে কাঁদে প্রাণ রাত্রি দিনে
যাবে বুঝি বিফলে জীবন॥

বুঝি মোর কর্ম্মমন্দ ভক্তির দোয়ার বন্ধ
কেমনে পৌঁছিব তব ঠাঁই।
শ্রীগুরু পাতত পাবন সর্ব্ব কলুষ নাশন
ইহাতে ভরসা যেন পাই ॥

ব্রজ নবদ্বীপ লীলা প্রকাশিলে অন্তবেলা
আকুল করিয়া ভক্ত প্রাণ।
শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে প্রেমভক্তি বিতরণে
জাগাইলে হৃদয় পাষাণ ॥

কবে বৃন্দাবনে যাব রাধা কৃষ্ণ সেবা পাব
গুরু পাদপদ্ম করি সার।
ভাসায়েছি দেহতরী শ্রীগুরু কাণ্ডারী
গুরুদাসে কর ভব পার।

—x—

(৯)

লুটের গান

প্রেমের ঠাকুর মৌনীবাবা
এসেছেরে ধরায়
সঙ্গে লয়ে ভক্ত পার্ষদ
নব যুগের স্থাপনায় ॥

বিচার নাই শুচি অশুচি
ব্রাহ্মণ কিংবা হাড়ী মুচি,
নামামৃত বিলায় জীবে
দয়াল পরম করুণায় ॥

এল আবার নামের জোয়ার
ঘুচিবে সংশয় অনাচার,
দূরে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা
কৃষ্ণ নামের মহিমায় ॥

না ব্রজে না নীলাচলে
এবার লীলা পূর্ব্বাঞ্চলে,
রাণীবাড়ী মহাতীর্থ
স্মরণীয় ভূতলে ।

নামের সন্দেশ নামের মিঠাই
ভক্তি ভরে লুটে নে ভাই,
চাই আনন্দ চাই প্রেম
কে নিবিরে ছুটে আয় ॥

— x —